

ইসলাম ও কুফর

মূল: হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী (রহ.)
অনুবাদক: মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

ইসলাম ও কুফর

মূল: হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)

অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে
মুহাম্মদ আবদুল আযীয আল-আমান, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: জুন ২০১৫ খ্রি. = শাবান ১৪৩৬ হি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ০২, বিষয় ক্রমিক: ১৪০

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কব্জবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী

ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, মেইল: mujahid_sach@yahoo.com

মূল্য : ৭০ [সত্তর] টাকা মাত্র

Islam O Kufr: By: Hakimul Ummat Ashraf Ali Thanabi (Rh.), Translated In Bangla By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 70 Tk

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

saajctg@yahoo.com

www.saajbd.org

ইসলাম ও কুফর

ঈমান ও কুফরের ১৪৫টি শাখা প্রশাখা

১. আল্লাহর অস্তিত্বে অটল বিশ্বাস

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হবে এটিই ঈমান। আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা সব চেয়ে বড় কুফরী।

২. আল্লাহর গুণাবলিতে অটল বিশ্বাস

শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেই ঈমান হবে না, আল্লাহর যাবতীয় মহৎ গুণাবলিও বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহই সারাজাহানের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, আল্লাহ সর্বদর্শী, সকলের আহারদাতা, জীবনদাতা, আল্লাহ ভালো, আল্লাহ মন্দ নয়। আল্লাহর সাদৃশ্য কিছুই নেই। কেউই নেই; আল্লাহ স্বয়ং চিরকাল আছেন চিরকাল থাকবেন, আল্লাহ আয় নেই, ক্ষয় নেই, নিরাকার নিরঞ্জন অনাদি, আল্লাহর কোনো দোসর শরীক বা স্ত্রী সন্তান ওয়ারিস নেই, আল্লাহর মাও নেই বাপও নেই। আল্লাহর কোনো অভাব নেই, আল্লাহ সকলের সকল অভাব মোচনকারী। এভাবে আল্লাহর যাবতীয় মহৎ গুণাবলি বিশ্বাস করতে হবে এটিই ঈমান। আল্লাহর মহৎ গুণাবলি অবিশ্বাস করলে তাও কুফরী হবে।

৩. আল্লাহর একত্বে অটল বিশ্বাস

আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ দুই বা ততোধিক হতে পারে না। আল্লাহর গুণাবলির বা কার্যাবলির মধ্যে কেউ শরীক হতে পারে না। আল্লাহর বন্দেগির মধ্যে কেউ শরীক হতে পারে না, এ ধরনের বিশ্বাস করতে হবে, এটিই ঈমান।

যদি কেউ দুই খোদা বা তিন খোদা মানে, সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে বা আল্লাহর কার্যাবলির মধ্যে অন্য কেউ কাউকে শরীক মানে বা

আল্লাহর বন্দেগির সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনো মতবাদেও বিশ্বাস করে বা অন্য কারও সামনে মাথা নত করে তবে সে মুশরিক-কাফির হবে।

৪. স্রষ্টা এক আল্লাহ অন্য সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি এই বিশ্বাস

সৃষ্টিকর্তা একজন। অন্য যতো যা কিছু আছে সবই তাঁর একজনেরই সৃষ্টি পদার্থ বা সৃষ্টজীব। তিনি একজন সৃষ্টিকর্তার মহান ও পবিত্র নামই ‘আল্লাহ’। এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য যতো যা কিছু আছে-আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পর্বত-সমুদ্র, অগ্নি-বায়ু, শয়তান-ফেরেশতা, (দৈত্য-দেবতা) শক্তি-ইখর, বিদ্যুৎ-পানি, আলো-উত্তাপ, সবই সেই এক অনাদি অনন্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহর সৃষ্টি একথা বিশ্বাস করতে হবে। তাঁর সৃষ্টির বাইরে কেউই নেই, কিছুই নেই এবং অন্য কেউ সৃষ্টিকর্তাও নেই এটিই ঈমান।

যদি কেউ অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা মানে বা কোনো বস্তুকে বা ব্যক্তিকে আল্লাহর সৃষ্টির বাইরে মনে করে তবে সে কাফির হবে।

৫. ফেরেশতা সম্পর্কে বিশ্বাস

বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ এক প্রকার নিষ্পাপ জীব সৃষ্টি করেছেন। কাম-ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি রিপু তাঁদের মধ্যে নেই। তাঁদের শক্তি অনেক। আল্লাহর আদেশের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম তাঁদের দ্বারা হতে পারে না। সংখ্যায় তাঁরা অনেক বেশি। আল্লাহ তাঁদের সৃষ্টি করে তাঁদেকে যে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন তাঁরা ঠিক সেই কাজেই লিপ্ত আছেন। আযাবের কাজ, রহমতের কাজ, মেঘ বর্ষণের কাজ, জীবের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, জীবের জীবন হরণের কাজ, আল্লাহর দরবার হতে আল্লাহর ওয়াহী হুকুম আসমানে-জমিনে বহন করে আনার কাজ। মোটকথা এ ধরনের সব কাজই তাঁরা করেন। তাঁদের বলা হয় ফেরেশতা। আল্লাহরই সৃষ্ট জীব তাঁরা, কাজেই ফেরেশতা বা দেবতারা পূজার যোগ্য নয়। পূজার যোগ্য এক আল্লাহ এটিই ঈমান।

ফেরেশতাদের মধ্যে চারজন সর্বপ্রধান জিবরাঈল ফেরেশতা ওয়াহী ও আল্লাহর আদেশ বহন করে পয়গম্বরদের নিকট আনতেন। মীকাঈল ফেরেশতা বর্ষণ কাজে নিযুক্ত। আযরাঈল ফেরেশতা জীবের জীবন হরণ কাজে নিযুক্ত। ইসরাফীল ফেরেশতা রুহরক্ষণ ও সিঙ্গা ফুঁকে দুনিয়াকে ভাঙ্গন-গড়ন কাজে নিযুক্ত।

যদি কেউ ফেরেশতা বা দেবতাদের পূজার যোগ্য বিশ্বাস করে বা তাদের পূজা করে তবে সে মুশরিক-কাফির হবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করে বা ফেরেশতারা আল্লাহর খেলাফ করেছে বলে বিশ্বাস করে সেও কাফির হবে, ইসলামী ধর্মীয় বিশ্বাস তার নষ্ট হবে।

৬. আল্লাহর নবী ও রাসূলের প্রতি অটল বিশ্বাস

অকট্যাভাবে বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহ নির্দিষ্টসংখ্যক মানুষকে নিষ্পাপ করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁদেরকে বলা হয় নবী-রাসূল-পয়গম্বর। নবীগণ সব নিষ্পাপ। দুনিয়ার মানুষকে সংবুদ্ধি দেওয়ার জন্য, সংপথ প্রদর্শন করার জন্য আল্লাহ শুধু কিতাব পাঠিয়ে ক্ষান্ত হননি। বরং সে কিতাব বুঝিয়ে নির্ভুল ব্যাখ্যা করে দেওয়ার জন্য এবং আমল করে নিখুঁত আদর্শ দেখানোর জন্য বহুসংখ্যক নবী, রাসূল বা পয়গম্বর পাঠিয়েছেন। পয়গম্বরের দায়িত্ব হচ্ছে যে, তিনি আল্লাহর বাণী হুবহু অবিকল যেমনটি তেমনই মানুষ সমাজকে পৌছিয়ে দেবেন এবং আমল করে আদর্শ দেখিয়ে দেবেন। মানুষ সমাজের কর্তব্য হচ্ছে যে, নবীকে তিনি যা কিছু আল্লাহর দরবার হতে নিয়ে এসেছেন, সবকিছু বিনা বাক্যব্যয়ে শিরোধার্য করে নেবে। তাঁকে খোদা মানবে না, খোদার বেটা মানবে না, খোদার রূপান্তর মানবে না, খোদার প্রতিনিধি ও নায়েব মেনে তাঁর সম্মান-মর্যাদা করবে, তাঁর প্রদর্শিত আদর্শ অনুসারে আল্লাহর বাণীর অর্থ গ্রহণ করে নিজ নিজ জীবনকে সে অনুযায়ী গঠন করবে। পয়গম্বরদের সিলসিলা হযরত নবী আদম (আ.) হতে শুরু হয়েছে এবং আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর শেষ হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ বাণীবাহক নবী রাসূল বা পয়গম্বর, এটিই ঈমান।

যদি কেউ নবী বিশ্বাস না করে বা নবীর আদর্শকে অস্বীকার করে বা নবীর ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কুরআনের ব্যাখ্যা করে বা নবীকে সাধারণ মানুষের মতো পাপী মানুষ মনে করে বা নবীকে খোদা বা খোদার বেটা মনে করে বা নবীকে খোদার রূপান্তর অবতার মনে করে বা নবীকে পূজার যোগ্য মনে করে বা সাধারণ মানুষকে নবী মনে করে বা নুবুওয়াত শেষ হয়ে যাওয়ার পর অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর অন্য কাউকে নবী বিশ্বাস করে, তবে সে ইসলামের নির্ধারিত সীমা হতে বাইরে চলে গেছে মনে করতে হবে এবং এটি কুফরী।

৭. আল্লাহর কিতাবের প্রতি অটল বিশ্বাস

অটাক্যভাবে আল্লাহর কিতাব বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ মানবজাতিকে সংবুদ্ধি দান করার জন্য এবং সংপথ প্রদর্শন করার জন্য অনেক কিতাব দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে অনেক ছিল শুধু সহীফা অর্থাৎ দুয়েক পাতার কিতাব এবং চারটি বড় কিতাব। তওরাত শরীফ হযরত মুসা (আ.)-এর ওপর নাযিল হয়। যবুর শরীফ হযরত দাউদ (আ.)-এর ওপর নাযিল হয়। ইনজীল শরীফ হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর নাযিল হয়। এ কিতাবসমূহে তৎকালীন মানুষরা হেফাযত করে রাখেনি, তাকে বিকৃত করে ফেলেছে। সেজন্য আল্লাহ সর্বরক্ষী সর্বব্যাপী সর্বশেষ কিতাব সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আহমদ মুজতবা

আখিরুয্ যামান সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর ওপর নাযিল করে তার হেফাযতের ভার নিজের যিম্মায়েই রেখেছেন। এ কিতাবকে কেউ বিগড়াতে বা বিকৃত করতে পারবে না। এ কিতাবের নাম: আল-কিতাব, আল-কুরআন বা ফুরকান। এ কিতাবের সমস্ত কথা সত্য এবং সমস্ত দুনিয়ায় মানুষ এর সমস্ত কথা মানতে বাধ্য, এটিই ঈমান।

যদি কেউ এ কিতাবের একটি কথাও মানতে অস্বীকার করে বা অবিশ্বাস করে সে ইসলামের দায়েরা হতে খারিজ হয়ে যাবে, এটা কুফরী।

৮. তকদীর সত্য বলে বিশ্বাস করা

বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ইচ্ছাশক্তি, কর্মশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি অর্থাৎ ভালো-মন্দ বোঝার শক্তি দান করেছেন। তার ভেতর কুপ্রবৃত্তিও সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ মানুষকে একেবারে ক্ষমতাহীনও সৃষ্টি করেননি, আবার সর্বশক্তিমানও সৃষ্টি করেননি। ভালো কাজ করার, ভালো চিন্তা করার, ভালো ইচ্ছা করার ক্ষমতাও মানুষকে দিয়েছেন। মন্দ কাজ করার, মন্দ চিন্তা করার, মন্দ ইচ্ছা করার ক্ষমতাও মানুষকে দিয়েছেন। সৃষ্টিজগতের ভালো আর মন্দ কু আর সু-র দু'জন সৃষ্টিকর্তা নেই। এক আল্লাহই কু ও সু উভয়ের সৃষ্টিকর্তা। কর্মজগতে মানুষকে বহু ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন, সৎকাজ বা অসৎকাজ করা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। এখানে আল্লাহ তাকে মজবুর বা জোর-জবরদস্তিপূর্বক 'সু' বা 'কু' করতে বাধ্য করেননি। ক্ষমতা দিয়ে বলে দিয়েছেন, 'কু'-এর বশ হয়ে যাও তবে আমি তোমার ওপর অসন্তুষ্ট। এখানেই তোমার পরীক্ষা। একদিন আমার কাছে সমস্ত হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ যেমন সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টির আগে সারা সৃষ্টিজগতের একটি নকশাও লিখে রেখেছেন। এ নকশার নামই তকদীর। কর্মজগতের নকশায় এভাবেই লেখা আছে, যদি মানুষ ইচ্ছা করে তবে এভাবে, যদি ইচ্ছা না করে, তবে সেই। এটাকে বলে তকদীরে মুআল্লাক। মানুষ কর্মের জন্য নিশ্চয়ই দায়ী যেহেতু সে নিজ ক্ষমতায়, নিজ ইচ্ছায় কর্ম করে, এ বিষয়ের প্রতি অকাটা বিশ্বাস রাখাই ঈমান।

পক্ষান্তরে যদি কেউ 'সু' ও 'কু'র জন্য দু'জন সৃষ্টিকর্তা মানে। যেমন-কোনো কোনো ফেরকা 'কু'র সৃষ্টিকর্তা 'আহরমন'কে মানে, হিন্দুরা 'সু'র সৃষ্টিকর্তা লক্ষ্মী দেবীকে এবং 'কু'র সৃষ্টিকর্তা শনি দেবতাকে মানে, তবে তা শিরক ও কুফরী। এভাবে যদি কেউ মানুষকে সম্পূর্ণ অক্ষম মনে করে দায়িত্বহীন মনে করে বা সর্বশক্তিমান মনে করে খোদার সৃষ্টির বাইরে ক্ষমতাসীল মনে করে তবে এটাও অ-ইসলাম বা ইসলামের গস্টির বাইরে।

৯. কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ সত্য বলে বিশ্বাস করা

অকাট্যরূপে বিশ্বাস করতে হবে, এ সংসার চিরস্থায়ী নয়। একদিন এ জমিন-আসমান, চন্দ্র-সূর্য, বৃক্ষ-পর্বত, সমুদ্র-প্রাসাদ, মানুষ-ফেরেশতা, গ্রহ-নক্ষত্র সব লয় হয়ে যাবে। মানুষ মরে যাবে। কিন্তু মানুষের এ নশ্বর দেহ মরবে, রূহ ও আত্মা মরবে না। মানুষ মরার পর একেবারের ফানা হয়ে যাবে না, তার দেহ চাই আঙনে পুড়ে ছাই হয়ে যাক, চাই কুমীরের পেটে বা বাঘের পেটে হজম হয়ে যাক, মৃত্যুর পর যে অবস্থায় থাকে তাকেই বলে ‘কবর’ তথা বরযখী জগৎ। শুধু মাটির গর্তকে কবর বলে না।

১০. কবরে পরীক্ষা সত্য বলে বিশ্বাস করা

কবরে মানুষের অতিসংক্ষেপে কিছু পরীক্ষা হবে, বিস্তৃত পরীক্ষা বিস্তৃত বিচার হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত হওয়ার পর হবে।

১১. হাশর ময়দানের অনুষ্ঠান সত্য বলে বিশ্বাস করা

হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়ার জন্য আদি-অন্তের সব মানুষের পুনরায় জীবিত হতে হবে।

১২. আমলনামার প্রাপ্তি বিশ্বাস করা

সকল মানুষের আমলনামা অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার জীবনে ভালো-মন্দ যা কিছু করেছে সব লিখিত অবস্থায় তাকে দেওয়া হবে।

১৩. নেকী-বদের ওয়ন হবে বিশ্বাস করা

সমস্ত ভালো-মন্দ ও সৎ-অসতের পরিমাণ করা হবে।

১৪. আল্লাহ তাআলার বিচার বিশ্বাস করা

পুনর্জীবিত হওয়ার পর মানুষকে আল্লাহ তাআলার বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

১৫. পুলসিরাতকে বিশ্বাস করা

দুনিয়ার জীবনে যে যেভাবে সৎ বা অসৎ জীবন যাপন করেছে ঠিক সেভাবে তার পুলসিরাত পার হতে হবে। যদি দুনিয়ার জীবনে সিরাতে মুস্তাকীমে তথা সৎপথে সে দুঢ় মজবুত থেকে থাকে তবে সে সেভাবে দৃঢ়তার সাথে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সাথে পুলহিরাত পার হবে। অন্যথায় সে বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হবে।

১৬. বেহশতকে বিশ্বাস করা

নেক্কার লোকগণ পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে পৌঁছবেন এবং তাঁরা সেখানে চিরসুখে সুখী হবেন।

১৭. দোযখকে বিশ্বাস করা

যারা দুনিয়ার জীবনে সিরাতে মুস্তাকীম তথা সৎপথ হতে পদস্থলিত হয়ে গিয়েছিল তারা পুলসিরাত পার হওয়ার বেলায়ও পদস্থলিত হয়ে দোযখে পতিত হবে এবং সেখানে শাস্তি ভোগ করবে।

৯ হতে ১৭ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি অকাট্য বিশ্বাস রাখাই ঈমান। যদি কেউ এসব বিষয়ের যেকোন একটিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করে তা অ-ইসলাম বা কুফরী হবে।

১৮. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভক্তি ও মুহাব্বত রাখা

উল্লিখিত ১৭টি কাজ শুধু দিলের ও অন্তরের বিশ্বাসের ক্রিয়ার দ্বারা সমাধা হবে বটে, কিন্তু ঈমান শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব বিশ্বাস করলেই পূর্ণ হবে না; বরং আল্লাহকে অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ভালবাসতে হবে এবং ভক্তি করতে হবে এটিই ঈমান। যদি কেউ অস্তিত্ব ও একত্বকে বিশ্বাস করে, কিন্তু আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত-ভালবাসা না রাখে তবে তাই হবে কুফরী।

১৯. আল্লাহর ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসা

শুধু আল্লাহকে ভালবাসলেই, ভক্তি করলেই ঈমান পূর্ণ হবে না, অধিকন্তু আল্লাহ যাকে তথা যে সৎ ব্যক্তিকে বা যে ভালো বস্তুকে বা যে ভালো কাজকে বা ভালো গুণকে ভালবাসেন, তাকে তথা সেই সৎ ব্যক্তিকে, সেই ভালো বস্তুকে, সেই সৎ কাজকে এবং সেই ভালো গুণকেও অন্তরের সাথে ভালবাসতে হবে। আল্লাহর নামীয় জিনিসসমূহকেও অন্তরের সাথে ভক্তি করতে হবে এবং আল্লাহ যাকে তথা যে অসৎ ব্যক্তিকে, যে মন্দ বস্তুকে বা যে মন্দ কাজকে এবং যে দোষকে ঘৃণা করেন, না-পছন্দ করেন তাকে তথা সেই অসৎ ব্যক্তিকে, সেই মন্দ কাজকে, সেই দোষকে অন্তরের সাথে ঘৃণা করতে হবে। এটাকেই বলে আল্লাহর দোস্তের সঙ্গে দুস্তি রাখতে হবে এবং আল্লাহর দুশমনের সঙ্গে দুশমনি রাখতে হবে, তবেই ঈমান পূর্ণ হবে। যদি কেউ আল্লাহর দোস্তের সঙ্গে আন্তরিক দুশমনি এবং আল্লাহর দুশমনের সঙ্গে আন্তরিক দুস্তি রাখে তবে তা হবে কুফরী। সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়।

২০. আল্লাহর রাসূলের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা

আল্লাহর রাসূলকে ভালবাসতে হবে এবং ভক্তি করতে হবে। রাসূলের পেয়ারা যাঁরা তাঁদেরকেও ভালবাসতে হবে। রাসূলের দূশমন যারা তাদের সাথে আন্তরিক দূশমনি রাখতে হবে। যদি কেউ আল্লাহর রাসূলকে ভাল না বাসে বা নিন্দা করে বা রাসূলের বিশ্বস্ত যাঁরা তাঁদের মন্দ জানে তবে তা হবে কুফরী এবং বুঝতে হবে যে, তার মধ্যে ঈমান প্রবেশ করেনি।

২১. আল্লাহর রাসূলের সুন্নত ও আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস রাখা

রাসূলের সাথে আন্তরিক মুহাব্বত রাখা যেমন ঈমানের অঙ্গ, তদ্রূপ রাসূলের সুন্নত অর্থাৎ আদর্শকে প্রাণের সাথে ভালবাসা এবং রাসূলের আদর্শকে জীবনের একমাত্র আদর্শ মনে করাও ঈমানের অঙ্গ।

যদি কেউ রাসূলের আদর্শকে অস্বীকার করে, তবে তা হবে কুফরী এবং বুঝতে হবে যে, সে মুসলমান নয়, ইসলাম সে গ্রহণ করেনি বা ইসলামকে বর্জন করেছে।

২২. আল্লাহর রাসূলের প্রতি দরুদ ও সালাম

রাসূলকে ও রাসূলের আদর্শকে এতো দূর ভালবাসতে হবে এবং এত মর্যাদা দিতে হবে যে, মানুষ যখন আল্লাহর সঙ্গে একাকী হয় এবং একাগ্রচিত্তে আল্লাহর কাছে তার মনের সব বেদনা খুলে বলে, তখনও যেন নিজের স্বার্থের আবদার জানানোর চেয়ে রাসূলের সঙ্গে এবং রাসূলের আদর্শের সঙ্গে তার ঐকান্তিক ভালবাসার পরিচয় বেশি দিয়ে আল্লাহর কাছেও যেন আবদার জানায়, ‘হে খোদা! আমি রাসূলকে ও রাসূলের আদর্শকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসি, তুমি তোমার এ পেয়ারা রাসূলের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দাও, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর মর্যাদা বাড়াতে থাকবে, আমার প্রাণের এ আবদার। তাঁর সঙ্গে তাঁর আদর্শ প্রচারে যাঁরা প্রাণ দিয়ে সাহায্য করেছেন সেসব আল ও আসহাবগণের মর্যাদাও বাড়িয়ে দাও।’ এটিকেই বলে দরুদ। দরুদ পাঠ করাও ইসলামের ও ঈমানের একটি অঙ্গ। যারা রাসূলকে বা রাসূলের আদর্শকে এতো ভালো না বাসে বা দরুদ ইনকার করে তাদের ঈমান নাকেস ও অসম্পূর্ণ।

২৩. নিয়ত খাস দিল খাঁটি রাখা

যেকোন কাজ করতে হলে গোড়ায় চাই নিয়ত খালেস-দিল ঠিক। ধর্মীয় কাজসমূহ যেমন- নামায, হজ-যাকাত ইত্যাদি। এগুলো তো খালেস নিয়ত ব্যতিরেকে আদৌ কোনো মূল্যই নেই। এছাড়া দুনিয়াদারীর সাংসারিক কাজে

এবং দান-খয়রাতের কাজেও নিয়ত খালেস হলে দ্বিগুণ ফল (মূল্য) পাওয়া যাবে। যেমন— দান করলে গরীবের উপকার হবে। ক্ষেত করলে ক্ষেতের ফসলে পেট ভরবে, একথা সকলের জন্য সত্য এমন কাফিরও দান করলে গরীবের উপকার হবে, গরীবের দুআ পাবে, ক্ষেত করলে ক্ষেতের ফসলে তার পেট ভরবে। কিন্তু যদি নিয়ত খালেস করে এসব কাজ করা যায়, তবে এ ফলের চেয়ে আরও বেশি ফল পাওয়া যাবে অর্থাৎ যদি এসব কাজও খাঁটি দিলে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, আল্লাহ সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ পরকালে বেহেশতে অনেক পুরস্কার দান করবেন, এ বিশ্বাস মজবুত করে, তবে দুনিয়ার ফলের সঙ্গে সঙ্গে আখিরাতের চিরস্থায়ী ফলও পাবে। কাজেই এ ফলকে এবং এ মূল্যকেই বলে সওয়াব। সারকথা আল্লাহর পুরস্কারের প্রতি বিশ্বাস এবং আল্লাহর পুরস্কারের জন্য লালায়িত হয়ে আল্লাহর সামনে আল্লাহর পুরস্কারের প্রতি বিশ্বাস এবং আল্লাহর পুরস্কারের জন্য লালায়িত হয়ে আল্লাহর সামনে আল্লাহর পুরস্কারের জন্য লালায়িত হওয়ার মতো নতিস্বীকার করাও ঈমানের এবং ইসলামের একটি অঙ্গ।

যাদের নিয়ত খালেস নয় অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে না, আল্লাহর পুরস্কারে যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহর পুরস্কারের জন্য লালায়িত হওয়ার মতো নতি আল্লাহর সামনে স্বীকার করে না তারা ঈমান হতে অনেক দূরে, তারা এখনও অ-ঈমান অ-ইসলাম চক্রে ঘুরছে।

২৪ ও ২৫. মুনাফিকী ও রিয়াকারী বর্জন করা

নিয়ত খালেস করাই সমস্ত জিন্দগির কাজের ফলাফলের ভিত্তিস্বরূপ। নিয়ত খালেস করার পথে যেমন অবিশ্বাসের উদ্ধত্যের বাধা আসে তেমনই সেই পথে যেমন মুনাফিকী এবং রিয়াকারীর বাধাও আসে। মুনাফিকী বলে, ভেতরে অবিশ্বাস করে বাইরে কপটাচারীর মতো, সুবিধাবাদীর মতো, স্বার্থবাদের মতো ধর্মকর্ম করাকে। আর রিয়াকারী বলে, মানুষের নিকট সম্মান বা সুখ্যাতি পাওয়ার আশায় ধর্ম-কর্ম করাকে। যখন কো ধর্ম-কর্ম করার সময় আল্লাহর প্রতি অভক্তির খেয়াল মনে আসে বা সুনাম সুখ্যাতির ওয়াসওয়াসা দিলে আসে তখন এ খেয়ালকে দমন করে রীতিমত সৎকাজ করে যাওয়াও ঈমানের ও ইসলামের একটি অঙ্গ। অর্থাৎ মুনাফিকীর ভাবকে, স্বার্থবাদী ভাবকে, সুবিধাবাদীর ভাবকে এবং সুনাম সুখ্যাতি লাভের ওয়াসওয়াসাকে দমন করে রেখে এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে সৎকাজ করে যাওয়া ঈমানের অঙ্গ। কারণ মানুষের উদ্দেশ্য সে জিনিসই হতে পারে যে জিনিস মানুষের চাইতে বড়। সামান্য স্বার্থ এবং মানুষের প্রশংসা মানুষের চাইতে বড় নয়।

মানুষের চেয়ে বড় এক খোদা, তাছাড়া আর কেউ বড় নেই। তওহীদের এ নমুনার বিকাশ মুসলমানের প্রত্যেক কাজেই হওয়া চাই। যারা মুনাফিকীর

ভাবকে, স্বার্থবাদিতার ভাবকে, সুবিধাবাদীর ভাবকে এবং সুনাম সুখ্যাতির ওয়াসওয়াসাকে দমন করে না, বরং এ স্রোতে ভেসে যায় বা শয়তানের এ শয়তানি ফেরেবে পড়ে সৎকাজ করতে বিরত থাকে তারা সত্যিকার ঈমান হতে ইসলাম হতে দূরে আছে, এটাও এক প্রকার অ-ইসলামের শাখা।

২৬. ভুল হয়ে গেলে স্বীকার করে তওবা করা

মানুষ মাত্রই ভুল আছে। মানুষ ভুল করবে না, পাপ করবে না, এ উদ্দেশ্যে নিয়ে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেননি। মানুষ ভুল করবে, পাপ করবে এটা জানা সত্ত্বেও আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ ভুল করে স্বীকার করবে, ত্রুটি স্বীকার করবে। ইচ্ছা করবে না সে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করতে, তা সত্ত্বেও তার এমন দুর্বলতা আছে যে, সে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে বসবে। কিন্তু তার মধ্যে এ গুণও আছে যে, সে আল্লাহর সঙ্গে মোকাবেলা করবে না ইবলিসের মতো, বরং যখনই তার চৈতন্য উদয় হবে তখনই সে কাকুতি-মিনতি করে বলবে, ভুল হয়েছে মাওলা, অন্যায় করেছে, ভুল করেছে, মাফ চাই মাওলা, মাফ কর। এ অনুতাপ, এ অনুশোচনা, এ ভুল স্বীকারের নামই তওবা। তওবাও ঈমানের একটি অঙ্গ। যে তওবা করে আল্লাহ তাকে আবার ভালবাসেন, তার ভুল-ত্রুটি সব মুছে ফেলেন। যে তওবা করে না, যে ভুল স্বীকার করে না, তার ঈমান, তার ইসলাম অ-সম্পূর্ণ, সে অ-ইসলাম জীবন যাপনের মধ্যে আছে।

২৭. আল্লাহর ভয় মনে রাখা

আল্লাহর আযাবের ও আল্লাহর গযবের ভয় অন্তরে রাখা ঈমানের অঙ্গ। আল্লাহর ভয় না রাখা বে-ঈমানের আলামত। শত ইবাদত-বন্দেগি করলেও আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখা চাই।

২৮. আল্লাহর রহমতের আশা রাখা

এটিও ঈমানের একটি বড় অঙ্গ। শত গোনাহ করলেও মানুষ বে-ঈমান হবে না যতক্ষণ তার আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত, ভক্তি ও আল্লাহর রহমতের আশায় আশান্বিত সে থাকবে। যদি কেউ আল্লাহর রহমতের আশা ছেড়ে নিরাশ হয়ে লা-পরওয়া হয়ে যায়, তখন সে হবে বেঈমান।

২৯. শোকর করা

মানুষ যা কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পায় বা চেষ্টা তদবীরে ফল পায় তা আল্লাহর অনুগ্রহের দান মনে করে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এটিকেই বলে শোকর, এটিও ঈমানের ও ইসলামের একটি অঙ্গ।

কোনো মানুষ কোনো উপকার করলে বা দান করলে তার নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়। এটিও আল্লাহরই নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। কেননা সে মানুষকে সৃষ্টি করেছে কে? আল্লাহই তো সৃষ্টি করেছেন। ওই মানুষের মনের মধ্যে উপকার ও দানের ভাব জাগিয়ে দিয়েছেন কে? আল্লাহই তো দিয়েছেন। এটিকেই বলে শোকর।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজের চেষ্টা-তদবীর, জ্ঞান-হুনের মাধ্যমে ও এর প্রতিক্রিয়ায় উপার্জিত হলেও উন্নতি ও ধন-সম্পদকে আল্লাহ তাআলার প্রতিদান গণ্য না করা এবং তাঁর ওপর শোকর না করা ঈমানহীনতার পরিচয়। পবিত্র কুরআনে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ধনী আল্লাহর গ্যবে পতিত কারুনের ঘটনার বর্ণনায় তার সে ধরনের মনোভাব ও উজ্জিকে তার বিশেষ অপরাধ বলে উল্লেখ করেছেন এবং এর ধরুন তার প্রতি তিরস্কার করত তার গ্যবে পতিত হওয়াকে এ অপরাধের প্রতিফল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

৩০. সবর বা ধৈর্যধারণ করা

চেষ্টা-তদবীরে ফল না পেলে দুঃখ-মুসীবতে বিপদগ্রস্ত হলে, তখন ভেবাচেকা না হয়ে, কর্তব্যচ্যুত না হয়ে স্থিরভাবে কর্তব্য কাজে অবিচলিত থাকার নাম সবর। মানুষ রোগে, রাগে, শোকে-তাপে, অভাব-অভিযোগে ধৈর্যহীন হয়ে কর্তব্যচ্যুত হয়ে পড়ে, চেষ্টা ছেড়ে দেয়। যারা একটু আল্লাহভক্ত বলে দাবি করে, তাদের মন আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়তে চায়। এসব শয়াতানি ওয়াসওয়াসা দমন রেখে ‘একবার না পারলে দেখ শতবার’ নীতিকে স্মরণ করে কৃতকার্যতা অকৃতকার্যতার ফল-বিফলের চিন্তায় না পড়ে আজীবন অচল-অটলভাবে কর্তব্য কাজ করে যাওয়ার নাম সবর। সবর ঈমানের অর্ধেক। যারা হাত-পা ভেঙে বসে বসে থাকাকে সবর বলে মনে করে, তাদের এ ধরনের মনে করাটা হয় অজ্ঞতার কারণে, না হয় শয়তানের প্ররোচণায়। যাদের সবর নেই তাদের ঈমান অঙ্গহীন, বরং অর্ধাঙ্গ।

৩১. আল্লাহর ওপর রাযী ও সন্তুষ্ট থাকা

কোনো সময় কিছুদিন মানুষ যদি অবস্থার চাপে অনুভব করে যে, আল্লাহ বুঝি এখন আর তাকে ভালবাসেন না বা উল্টো আরও রাগ করেছেন, বিপদগ্রস্ত করছেন, তখনও তার কর্তব্য হচ্ছে যে, সে যেন নিজেকে আল্লাহ বিশ্বস্ত প্রভু-ভক্ত গোলামই প্রমাণ করে এবং বিপদ-মুসীবতেও যেন সে মাওলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। বস্তুত এটা তার বোঝার ভুল যে, সে মনে করছে, আল্লাহ বুঝি তাকে ভালবাসেন না বা আল্লাহ বুঝি রাগ করে তার ওপর বিপদ আনছেন। তার মনে করা উচিত যে, আল্লাহ তাকে তার চেয়ে বেশি ভালবাসেন। তবে তার ক্রিয়ার প্রতিফলন তার

ভোগ করতে হবে বা আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, ফলে তার আরও প্রমোশন হয়ে উন্নতি হবে, এটিই হল মুমিন মুসলমানের পরিচয়।

পক্ষান্তরে যারা ফল না পেয়ে বিফল হয়ে বা বিপদগ্রস্ত হয়ে প্রভুকে ছেড়ে দেয় বা প্রভুর নিন্দা করে, তারা কি মানুষ? তার কৃত্য নয় কি? তারা ইসলাম হতে দূরে আছে।

৩২. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা

আল্লাহকে এক জনার অর্থ শুধু এক জানা নয়, আল্লাহকে সর্বশক্তিমান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বনিয়ন্তা, সর্ববিধাতা ও সর্বকর্মের সমাধাকারী মানতে হবে। অর্থাৎ মানুষ চেষ্টা করবে, চেষ্টা করারই আদেশ তাকে করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে চেষ্টা মানুষের কর্তব্য। চেষ্টাকে ফলবতী করা, চেষ্টার ফল দেওয়া মানুষের ক্ষমতার বাইরে, এটি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, এটিকেই বলে তাওয়াক্কুল। নতুবা চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে হাত পা ভেঙে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করাও ঈমানের একটি অঙ্গ। আল্লাহকে যে মান্য করে, বিশ্বাস করে, সে সব চেষ্টা করে ফলদাতা মনে করে আল্লাহকে।

আর যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, সে নিজের বাহুবলকে নিজের চেষ্টাকেই ফলদাতা মনে করে, এটা অ-ইসলাম। যেমন আদৌ চেষ্টা ছেড়ে অকর্মা ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাও অ-ইসলাম।

৩৩. দয়া

প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া করাও ঈমানের একটি শাখা। নির্দয়-নিষ্ঠুর হওয়া কুফরীর শাখা।

৩৪. দান-সাখাওয়াতি

সাখাওয়াতি করা অর্থাৎ দানশীলতা, দান করার অভ্যাস করাও ঈমানদারের আলামত ও ঈমানের অঙ্গ। সাখাওয়াতির উল্টা বখীলী বা কনজুছি করা কুফরীর শাখা।

৩৫, ৩৬ ও ৩৭. নম্রতা, ভদ্রতা, উদারতা

নম্র স্বভাব হওয়া, লোকের সঙ্গে নম্র ব্যবহার, ভদ্র ব্যবহার উদার ব্যবহার করা ঈমানে অঙ্গ। বড়দের সামনে আদব ও নম্রতা, মুরক্বি শ্রেণির মান্যতা, সমশ্রেণির সঙ্গে ভদ্রতা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা গরীব ও নিম্ন শ্রেণির লোকদের সঙ্গেও উদারতা ব্যবহার করা ঈমানের অঙ্গ।

অহঙ্কার, গরুরি, বে-আদবী, তাকাবুরী, মুরব্বি অমান্যতা, লোকের সঙ্গে অভদ্রতা ব্যবহার, রুঢ় ও কর্কশ ব্যবহার, বদমেজাজী এসব কুফরীর শাখা।

৩৮. অহঙ্কার বর্জন করা, অন্যকে তুচ্ছ না করা

যখন তাকাবুরীর ভাব মনে আসে, অহঙ্কারের খেয়াল মনের মধ্যে দেখা দেয়, তখন সে খেয়ালকে দমন করে নম্র ব্যবহার করা ঈমানের অঙ্গ।

তাকাবুরীর খেয়ালে গর্বিত থাকা কুফরীর শাখা, নিজেকে বড় মনে করে অন্যকে তুচ্ছ করা কুফরীর শাখা।

৩৯ নিজেকে বড় মনে না করা

শুধু নিজের মতটাই ভালো লাগে, শুধু নিজের প্রশংসাই শুনতে বা নিজ মুখে নিজের তা'রীফ করতে মনে চায়, এটাকে বলে ওজব অর্থাৎ খোদবীনী ও খোদরাযী। এটা অতিমারাত্মক রোগ, মানুষের উন্নতির মূলে কুঠারাত্মক করে। যখন এ ধরনের মনে আসে তখন সে খেয়ালকে দমন করে সহিষ্ণুতার ভাব অবলম্বন করা এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি দান করাও ঈমানের শাখা।

পক্ষান্তরে অন্যের মতকে তুচ্ছ করে, অন্যের তাহকীককে বরদাশত না করে শুধু নিজের মতকেই ভালো মনে করা এবং সংকীর্ণতা অবলম্বন করা এটা কুফরীর শাখা।

৪০. ঈর্ষা পরিত্যাগ করা

মানুষের মনের ভেতর একটি কঠিন রোগ এও আছে যে, অন্যের ভালো, অন্যের উন্নতি দেখলে মন জ্বলে, তা সহ্য হতে চায় না, বরং তাকে কোনো উপায়ে অপদস্থ করা যাবে সেই চিন্তা। যখন এ ধরনের কুচিন্তা মনে আসে তখন এটাকে দমন করে মনোভাবের বিপরীত সেই ব্যক্তির সঙ্গে খায়রখাহী বা মঙ্গল কামনার ব্যবহার করা ঈমানের শাখা।

পক্ষান্তরে খায়েরখাহী না করে তার অবনতির চিন্তা বা চেষ্টা করা এটাকে বলে হাসাদ বা ঈর্ষা। এটা কুফরীর শাখা।

৪১. ক্রোধ রিপুকে দমন করা

আল্লাহ মানুষকে রাগ বা ক্রোধ দান করেছেন। এর সদ্যবহার করতে পারলে এটি উপকারী হয়। কিন্তু সদ্যবহার করা বড় সাধনার কাজ। যারা সাধনা না করে রাগ রিপুর বশ হয়ে যায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের আত্মা মলিন হয়ে

যায়। রাগের সময় বুদ্ধি ঠিক থাকে না। অতএব রাগকে দমন করার অভ্যাস করা ঈমানের শাখা।

পক্ষান্তরে রাগ-রিপুর বশ থাকা কুফরীর শাখা।

৪২. মনোমালিন্য পরিত্যাগ করা

রাগের প্রতিশোধ নিতে না পেরে অথবা হিংসা-বিদ্বেষ বা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে মনে মনে অনেক সময় মানুষের সঙ্গে শত্রুতাভাব মনোমালিন্যভাব পোষণ করে। যখন মনে এ ধরনের শত্রুতাভাব বা মনোমালিন্যতা ভাব দেখা দেয় তখন মনটাকে পরিস্কার করে ফেলা ক্ষমা করে দেওয়া ঈমানের অঙ্গ।

আর ক্ষমা না করে মনটাকে পরিস্কার না করে মনের মধ্যে ময়লা পুরে রাখা, শত্রুতাভাব পোষণ করা, প্রতিশোধ নিবার চিন্তায় থাকা এসব কুফরীর শাখা।

৪৩. নিজের বিচার নিজে করা

নিজের বিচার নিজে করা ঈমানের একটি প্রধান অঙ্গ। নিজের বিচার নিজে করলে তার দ্বারা কোনো অন্যায় হতে পারে না। ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলেও সে নিজেই ভুল স্বীকার করে নেয়।

পক্ষান্তরে নিজের বিচার নিজে না করলে অনেক সময় ছোটদের ওপর অন্যায়-অবিচারের ঘটনা ঘটে যায়। যেহেতু ছোটগণ বড়দের কিছু বলার সাহস পায় না। নিজের হিসাব নিজে না নেওয়ার অভ্যাস করা, নিজের বিচার নিজে না করার অভ্যাস করা অ-ইসলামের একটি শাখা।

৪৪. নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা হওয়া

মানুষের স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক হওয়া অর্থাৎ সত্য যা, ন্যায় যা, আল্লাহর পছন্দনীয় যা, তা প্রকাশ করতে আদৌ কোন ভয়, ইতস্তত বা দুর্বলতা প্রকাশ না করা। যদি দুর্বলতা মনে আসে তাকে দমন করে রাখা ঈমানের একটি অঙ্গ।

পক্ষান্তরে সত্যকে, ন্যায়কে, ধর্মকে প্রকাশ করতে ভীত হওয়া ইসলামের বিপরীত স্বভাব।

৪৫. শ্রীলতা রক্ষা করার মতো সংসাহস

শ্রীলতা রক্ষা করা অর্থাৎ হায়া-শরম রক্ষা ঈমানের অঙ্গ। কোনো মন্দ কাজ করার সময় লোকে কি বলবে, এ বলে মনে যে এক প্রকার সংকোচ ভাবের উদয় হয় অথবা অন্যে দেখলে তার কাম-ভাবের বা লোভের বা ঘৃণার উদ্বেক

হতে পারে, এমন কোনো কাজ করার ইচ্ছা হয় এবং লোকে দেখলে সংকোচ বোধ হয়, এ সংকোচবোধকে বলে, হায়া-শরম বা শ্লীলতা। শ্লীলতাবোধ যার নেই অর্থাৎ হায়া-শরম যার নেই তার মনুষ্যত্ব নেই। লোকে সাধারণত বলে থাকে, ‘শরমের চেয়ে মরণ ভালো’ একথাটি হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। এজন্যই পুরুষের নানী হতে হাঁটু পর্যন্ত জায়গা অন্য লোকের সামনে খুলতে সংকোচবোধ হয়, সাধারণ লোকের সঙ্গে বসে খেতে সংকোচ লাগে, অন্যের সামনে নিজের স্ত্রীকে পেয়ার করতে সংকোচ বোধ হয়, স্ত্রীলোকের জেওর কাপড়ের সৌন্দর্য বা চেহারা অন্য পুরুষে দেখলে তাতে সংকোচ বোধ হয়, এ সংকোচ বোধকেই বলে, হায়া-শরম বা লজ্জা ও শ্লীলতা, এটি ঈমানের অঙ্গ। এভাবে কোনো অন্যায় কাজ বা পাপের কাজ করতে সংকোচ বোধ হয় যে, লোকে বলবে? আল্লাহকে কি করে মুখ দেখাব! এ ধরনের অনুভূতি ঈমানের প্রধান একটি অঙ্গ।

যাদের এ অনুভূতি নেই তারা বেহায়া, তাদের ঈমানের অঙ্গহানি হয়ে গেছে। ইসলামের শত্রুরা বহু কোশেশ করে, বহু টাকা খরচ করে এবং বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে অধুনা স্ত্রী-পুরুষদের হতে এ অনুভূতি অনেকাংশে নষ্ট করে দিতে পেরেছে। এটা মানবসমাজের জন্য অতিবড় অহিতের কাজ। এতে যে শুধু মুসলমানের ধর্ম নষ্ট হয়েছে তা নয়, এতে জগতের মানুষ শুধু অসভ্য হয়নি, বরং জগতের মানুষ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে। কুৎসিৎ ছবি, স্ত্রী-চিত্র দর্শন, স্বামী-স্ত্রীর গোপন মিলনের রূপ দর্শন ও শ্রবণ ইত্যাদি পুরুষের পক্ষে তার চিন্তাশক্তির, তার জ্ঞানের উন্নতির, তার চরিত্রের, তার বংশোদ্ভূতির ও আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে অতিমারাত্মক প্রতিবন্ধক।

৪৬. গায়রতদার হওয়া

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বা শ্রদ্ধেয় বস্তুর নিন্দা বা অবমাননা দেখলে চেতনশক্তি সম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিকভাবেই একটা গোস্বার উদ্বেক হয়। এসব ক্ষেত্রে এইরূপ গোস্বাকে বলে, গায়রত। এ ধরনের গায়রত ঈমানের একটি অঙ্গ। যেমন— যদি কেউ আমার মাকে বা বাপকে অযথা গালি দেয় বা নিন্দা করে তবে আমার গোস্বা আসবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ আল্লাহকে, আল্লাহর রাসূলকে বা কুরআন শরীফকে বা কা’বা শরীফকে বা ইসলাম ধর্মকে তুচ্ছবোধক কোনো কথা বলে, তবে তাতে প্রত্যেক চেতনাশীল মুসলমানেরই গোস্বা আসবে। এ ধরনের গোস্বাকে বলে, গায়রত। এ ধরনের গায়রত দুষণীয় নয়, বরং অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং এটি ঈমানের অঙ্গ।

এ ধরনের চেতনা না থাকা ঈমানহীনতার পরিচয় এবং এটা অ-ইসলামিক শিক্ষার প্রভাব।

৪৭. সত্য কলেমাকে মুখে স্বীকার ও প্রকাশ করা

শুধু মনের বিশ্বাসকেই ঈমান বলে না। ঈমানের জন্য মুখের স্বীকারোক্তিও দরকার। আল্লাহর একত্ববাদ এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্যতা ও আনুগত্য মুখে স্বীকার করা এবং সর্বসমক্ষে ঘোষণা দেওয়াও ঈমান ও ইসলামের মৌলিক বুনিয়াদ। কলেমা শাহাদত অর্থাৎ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ.

এজন্যই এ কালিমাকে ইসলামের বুনিয়াদ বলা হয়। একবার মনে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করলেই মানুষ মুমিন বা মুসলমান হয়ে যায়। তারপর এ কালিমার যিকর অর্থাৎ মনের দিকে খেয়াল রেখে পুনরাবৃত্তি যত অধিক করবে ততই ঈমান শক্তিশালী এবং মজবুত হবে।

মুখে এ কালিমার স্বীকারোক্তি ব্যতিরেকে কোনো মানুষ মুসলমান হতে পারে না। যারা বলে, ধর্ম দিলের জিনিস, মুখে প্রকাশের কি দরকার তারা ভুল বলে। এ ধরনের যারা আসল বিষয়কে অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্যতা ও আনুগত্যকে মনে বিশ্বাস না করে শুধু মুখে উচ্চারণ করাকে ঈমান ও ইসলাম মনে করে তারাও ভুল করে। অবশ্য মনে যদি আল্লাহর একত্ব এবং রাসূলের সত্যতা ও আনুগত্যের বিশ্বাস ঠিক থাকে, কিন্তু কালিমার শব্দার্থ না বুঝেই কালিমা পড়ে তবে এ পড়া বৃথা যাবে না, বরং এ পড়ারও অনেক অনেক মূল্য আছে।

৪৮. কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা

কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে করা ঈমানের একটি অঙ্গ। কুরআন শরীফের অর্থ বুঝতে হবে অর্থাৎ আরবী সাহিত্যের ব্যুৎপত্তি জন্মিয়ে কুরআনের অর্থ তবে অন্তত অন্য কোনো বিশ্বস্ত ভাষা ও বিষয়ে জ্ঞানীর লিখিত বা মৌলিক বর্ণনা শুনে হলেও কুরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। কারণ কুরআন আল্লাহর বাণী।

আল্লাহ সকলের, কোনো একজনের বা কোনো এক সম্প্রদায়ের নন। কাজেই সকলেরই আল্লাহর বাণীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত আবশ্যিক। যারা অর্থ বুঝে আল্লাহর কালাম পাঠ করবে, তাদের তো অনেক উচ্চ দরজা আছেই, কিন্তু যারা না বোঝা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর কালামের প্রতি অগাধ ভক্তি সহকারে শুধু লফ্‌য ও শব্দ তেলাওয়াত করবে তারাও আল্লাহর কাছে অনেক পুরস্কারের অধিকারী হবে।

কুরআন পাঠ না করা কুরআনের অর্থ বোঝার চেষ্টা ও চিন্তা না করা ঈমান কমজোর হওয়ার আলামত এবং এটা ইসলাম বিরোধী কাজ।

৪৯ ও ৫০. কুরআন হাদীসের সত্যকে

শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া এবং প্রচার করা

আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদীস শিক্ষা করা এবং তা শিক্ষা করতে আনুষঙ্গিক ভাষা, ব্যাকরণ, ব্যাখ্যা, টীকা, পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের জ্ঞান, গবেষণা, চরিত্র গঠন যা কিছু লাগে সেসব শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া এবং প্রকাশ করা ও প্রচার করা ঈমানের অঙ্গ।

যারা কুরআনভিত্তিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত তারা ইসলামের আলো হতে বঞ্চিত। এজন্যই ইসলামের আলো হতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যেই ইসলামের শত্রুরা যেখানে তাদের ক্ষমতা চলছে অন্য ধরনের শিক্ষার ধারা জারি করেছে এবং তার ফলে ইসলামের সত্যিকার আলো হতে লোক বঞ্চিত হয়ে গেছে। যাঁরা ইসলামী বিদ্যা অর্থাৎ দীনী ইলম শিক্ষা করে সে বিদ্যার চর্চা অনুশীলনে আলেমের দরজা বড়। আলেমের কাজ অর্থ উপার্জন বা ক্ষমতা অর্জন নয়। আলেমের কর্তব্য জ্ঞানার্জন এবং সমাজকে নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান দান! ধর্মবিদ্যা শিক্ষা করে, ধর্মজ্ঞান অর্জন করে যিনি অন্যকে সে জ্ঞান দান করেননি বা সেই অনুযায়ী সর্বাত্মে নিজের জীবন গঠন করেননি তিনি ঈমানের বড় দৌলত হতে বঞ্চিত এবং প্রবঞ্চিত হয়েছেন।

৫১. আল্লাহর কাছে দুআ করা

আল্লাহর কাছে দুআ করাও ইসলামের একটি অঙ্গ। দুআর অর্থ হচ্ছে যে, আল্লাহর কাছে নিজের অভাব-অভিযোগ জানিয়ে কাকুতি-মিনতি করে আন্তরিক ভক্তি সহকারে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

শুধু নিজের বাহুবলের ওপর ভরসা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করা অ-ইসলাম। এ ধরনের চেষ্টার কাজে চেষ্টা না করে শুধু দুআর ওপর ভরসা করে বসে থাকাও অ-ইসলাম।

৫২. আল্লাহর যিকর করা

আল্লাহর যিকর করা অর্থাৎ আল্লাহর নাম স্মরণ করা, আল্লাহর গুণাবলিসহ আল্লাহর নাম মুখে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করে দিলে খেয়াল করে ধ্যান ও মুরাকাবা করা, আল্লাহর গুণসমূহকে নিজের আত্মা ও দেহের ভেতর প্রতিষ্ঠিত করা ঈমানের একটি অঙ্গ।

আল্লাহর যিকর না করা অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলি হতে দূরে থাকা। এতে ঈমানের উন্নতির হানি হয়।

৫৩. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা

আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাও ঈমানের একটি অঙ্গ। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাকে আরবী ভাষায় ইস্তিগাফর বলে। মানুষ মাত্রেরই দোষ-ত্রুটি আছে, সেজন্য আল্লাহর নিকট শুধু মনে মনে ক্রন্দন ও অনুতাপ করা নয়, মুখেও কাতরস্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার, এতে ঈমানের উন্নতি হয়।

প্রভুর নিকট দোষ করে ক্ষমা প্রার্থনা না করা বা নিজের দোষ-ত্রুটির অনুভূতি না থাকা অ-ইসলাম। এ ধরনের মনকে না কান্দিয়ে বা অন্যায় পরিত্যাগ না করে এবং পাপের জন্য প্রকৃতরূপে অনুতপ্ত না হয়ে শুধু মুখে ‘আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াতুবু ইলাইহি’ পড়ারও বিশেষ কোনো মূল্য নেই।

৫৪. বেহুদা কথা পরিত্যাগ করা

অনেক মানুষের বৃথা ও বেহুদা কথা বলার অভ্যাস থাকে বা মনে চায়। এ কু-অভ্যাসকে পরিত্যাগ করা এবং মনকে চিন্তার দ্বারা মার্জিত করে সুকথা বলার এবং কুকথা ও বৃথা না বলে চেপে রাখার অভ্যাস করাও ঈমানের একটি অঙ্গ।

এ কু-অভ্যাসকে বর্জন না করে পালন করলে ঈমানের অঙ্গহানি হবে।

৫৫. দেহের ও পোশাকের পবিত্রতা

আত্মাকে যেমন মিথ্যা বিশ্বাস এবং অন্যান্য হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, স্বার্থপরতা, নির্দয়তা, নির্ভরতা ইত্যাদি ময়লা হতে পাক পবিত্র রাখতে হবে। এজন্য ওয়াযু, গোসল, পাক-নাপাক, হালাল-হারাম চিনতে হবে এবং পালন করতে হবে। এটিও ঈমানের ও ইসলামের একটি অঙ্গ।

ওয়াযু-গোসল না চেনা, পাক-নাপাক না মানা, হালাল-হারাম না বাছা অ-ইসলাম।

৫৬. সতর ঢেকে রাখা

সতর তথা কুৎসিৎ বা উদ্ভেজनावর্ধক অঙ্গ ঢেকে রাখা ইসলামের একটি অঙ্গ। সতর আরবী শব্দ, এর অর্থ ঢেকে রাখা। কিন্তু বাংলাদেশে সাধারণত মানুষের শরীরের যে অংশকে ঢেকে রাখা উচিত তাকেই সতর বলে। আরবীতে এটাকে আওরাত বলে। মানুষের যে অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে কামভাবের

উদ্দেশ্য হওয়া স্বাভাবিক তাকেই বলে সতর। ইসলামী শরীয়াতে এর সীমারেখা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। পুরুষের নাভী হতে হাটু পর্যন্ত সতর এবং স্ত্রীলোকের পর-পুরুষের পক্ষে সর্বশরীর সতর অর্থাৎ পর-পুরুষ হতে সম্পূর্ণ শরীরকেই আবৃত করে রাখতে হবে। এমনকি যে কাপড়ের দ্বারা স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় সে কাপড়কেও পর-পুরুষ হতে আড়ালে রাখতে হবে। প্রয়োজনবশত রাস্তা-ঘাটে বের হতে হলে সমস্ত শরীর এবং পরিধানের জেওর, কাপড়কে আবৃত করে শুধু পথ দেখার যোগ্য চক্ষুটুকু খোলা রাখবে। তাছাড়া সমস্ত শরীরকে এবং সমস্ত সৌন্দর্যকে আবৃত করে রাখবে। এটি স্ত্রীলোকের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত ফরয। কোনো মানুষের মনগড়া মতবাদ নয় বা পুরুষদের পক্ষপাতিত্ব নয়। যে সৃষ্টিকর্তা পুরুষের পেটে সন্তান জন্মান, যে সৃষ্টিকর্তা পুরুষের স্তনে শিশুর জীবন রক্ষার দুগ্ধ না জন্মিয়ে স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধ জন্মান সে সৃষ্টিকর্তার এ নির্দেশ। এটি স্ত্রীজাতির জন্য অবশ্য পালনীয় হুকুম।

যারা মাহরাম রেশতাদার অর্থাৎ অতিঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন যেমন- বাপ-দাদা, নানা, আপন মামু, আপন চাচা, আপন ভাই, আপন ভতিজা, আপন ভাঞ্জা তাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সতর নাভী হতে হাটু পর্যন্ত এবং উর্ধ্ব শরীরের বুক-পেট।

সতর খোলা অন-ইসলামিক ভাব এবং অসভ্যতা। আজকাল একদল লোক এ ধরনের অসভ্যতাকেই সভ্যতার নামে চালু করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এটা অসভ্যতাই। এ যমানা ঘোঁকাবাজির যমানা। ঈমানদারগণের ঘোঁকা হতে বাঁচার জন্য সতর্ক হওয়া চাই।

৫৭. পাঞ্জেরানা নামায কায়েম করা

মানুষ যে আল্লাহ তাআলার আজ্ঞাবহ বান্দা একথার প্রমাণের জন্য মানুষের কর্তব্য দৈনিক পাঁচবার আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হয়ে একতাবদ্ধভাবে, দলবদ্ধভাবে আল্লাহর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো। আল্লাহর স্তুতি করে, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য স্বীকার করে, সব কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, আল্লাহর সামনে মস্তক অবনত করা এবং আল্লাহর সামনে মাটিতে মাথা রেখে আল্লাহকে সেজদা করা এবং ইহকাল পরকালের যাবতীয় অভাব-অভিযোগ আল্লাহর দরবারে আরজ করে অভাব মোচনের জন্য এবং চরিত্র সংশোধনের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাকে বলে নামায। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। এছাড়া নফলের দ্বারা আরও আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। নামায ইসলামের প্রধান একটি বুনিয়াদ।

যারা নামায কায়েম করে না তারা ইসলামের সৌধকে অ-ইসলামের প্রভাবের দ্বারা ভেঙে ফেলার অপরাধে অপরাধী।

৫৮. যাকাত দান করা

যাকাত ইসলামের সৌধের তৃতীয় খাম্বা। মানুষ দুনিয়াতে অবশ্য অর্থ উপার্জন করবে, উপার্জনের বেলায় যেমন— সুদ, ঘুষ, চুরি, খেয়ানত, ধোঁকা, ফাঁকি, মাপে কম, যুলুম, জবরদস্তি, ডাকাতি ইত্যাদি হতে নিজের উপার্জনকে পবিত্র রাখবে। অন্যের রক্ত শোষণ করে নিজে অর্থ সংগ্রহ করবে না। তদ্রূপ আবার অর্থ উপার্জন করেও সব নিজে (একা) খাবে না, গরীব, দুঃখী ও কাঙ্গালের সাহায্য করবে। ধর্মের উন্নতির কাজে, সমাজের উন্নতির কাজে সাহায্য করবে। চল্লিশ ভাগের একভাগ তেজারতের মাল এবং টাকা-পয়সা দান করা ফরয। জমির ফসলের দশ ভাগের একভাগ দান করা ফরয (এটিকে ওশর বলে। এর বিস্তারিত বিবরণ অভিজ্ঞ আলেমের নিকট জেনে নেবেন।) এটিকেই বলে যাকাত। যাকাত ইসলামের প্রধান একটি অঙ্গ এবং নিজের ও নিজ পরিবারবর্গের খরচ বাদ অতিরিক্ত দান করা নফল।

যারা যাকাত দান না করে তারা ইসলাম বিরোধী কাজ করে। ইসলামের নাম দিয়ে অ-ইসলামের কাজ করার মতো জঘন্য ব্যবহার আর কি হতে পারে?

৫৯. বন্দী মানুষকে মুক্তিদান করা ঈমানের একটি অঙ্গ

কুরআনের শব্দ: ^১مُؤْتَاةٌ মানুষ নানা রকম শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। কেউ দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। কেউ যালেম, শক্তিশালী মানুষের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। আয়াতের প্রথম অর্থ: দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান করা। মানুষের মনগড়া শাসনতন্ত্রের পরাধীনতা হতে, মানুষপূজা হতে, মূর্ততার অন্ধকার হতে, অন্ধ বিশ্বাস হতে ও অন্ধ অনুকরণের সংস্কারের অন্ধকার ইত্যাদি হতে মানুষকে মুক্তি দান করা আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ। মানুষকে আল্লাহ পাক স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ শুধু এক সৃষ্টিকর্তার অধীনে থাকবে, তাছাড়া অন্য কারও অধীনতা স্বীকার করা মানুষের মানবতার পক্ষে অতিঅপমানজনক। প্রকৃতপ্রস্তাবে মানুষের স্বাধীনতাই মানুষের গৌরব এবং মানুষ প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীন তখনই হতে পারে যখন সে তার সৃষ্টিকর্তার অধীন হয়। নতুবা এক সৃষ্টিকর্তার অধীনতা অস্বীকার করলে মানুষ হাজার হাজার নিকৃষ্ট জীব, নিকৃষ্ট শক্তি, এমনকি নিকৃষ্ট বস্তুর পর্যন্ত অধীন হয়ে পড়ে। এজন্যই দেখা যায়, মানুষ আল্লাহর অধীনতা ছেড়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে নানা রকম কুসংস্কারের অধীন হয়ে পড়ে। এমনকি সূর্য, মৎস্য, বৃক্ষ ইত্যাদির পর্যন্ত পূজা শুরু করে। কেউ কামীনি কাঞ্চনের অধীন হয়ে পড়ে, এটা মানবতার পক্ষে অতি বড় কেলেঙ্কারীর কথা। এসব প্রকার বন্ধন হতে মানুষকে আজাদ করা মানুষের কর্তব্য। এটি ইসলামের একটি অঙ্গ।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বালাদ, ৯০:১৩

মানুষকে বন্ধনমুক্ত করার চেষ্টা ও চিন্তা না করা অ-ইসলাম। শুধু নিজের পেটপূর্তির চিন্তা, অন্য মানুষ বা সমাজের সুখ শান্তি এবং উন্নতি শ্রীবৃদ্ধির চিন্তা না করা ইসলামের শিক্ষা নয়।

৬০. ভুখাকে অন্ন দান করা

দান করা ইসলামের একটি অঙ্গ। ভুখাকে অন্নদান করা বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করা, জ্ঞানহীনকে জ্ঞানদান করা, ধর্মহীনকে ধর্মদান করা, এটি ইসলামের একটি অঙ্গ। দান করে পুঁজিপতি হওয়া অ-ইসলাম।

৬১. মেহমানের খেদমত করা

অতিথি সেবা করা, মেহমানের খেদমত করা ইসলামের একটি অঙ্গ। মেহমানের খেদমত না করা, মেহমানের ইজ্জত না করা অ-ইসলামের।

৬২. রোযা ব্রত পালন করা

ফরয এবং নফল রোযা রাখা। রোযা রেখে সংযম অভ্যাস করা এবং গরীবের কষ্টের অনুভূতি নিজের ভেতর পয়দা করা ইসলামের একটি মৌলিক অঙ্গ। ফরয রোযা না রাখা ইসলাম বিরোধী কাজ।

৬৩. হজ ব্রত পালন করা

হজ করা অর্থাৎ টাকা উপার্জন করে যাতায়াত পরিমাণ সংগ্রহ করে ইসলামের কেন্দ্রে গিয়ে আল্লাহর খাস তাজাল্লীর ঘর দর্শন করা এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম পালন করা ইসলামের মৌলিক একটি অঙ্গ। ফরয হজ আদায় করার পর সামর্থ্য অনুসারে নফল হজ করলে ঈমানের উন্নতি হবে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ না করা মুসলমানি নয়, ইসলাম বিরোধী।

৬৪. ওমরা করা

ওমরা করা অর্থাৎ ছোট হজ করাও ইসলামের একটি অঙ্গ। হজের জন্য খাস করে ৯ যিলহজ তারিখে আলাফার ময়দানে যেতে হয়, মুযদালিফায় থাকতে হয়, মিনার মধ্যে শয়তানকে পাথর মারতে হয়। কিন্তু ওমরা অর্থাৎ ছোট হজের জন্য নির্দিষ্ট কোন তারিখ নেই, যেকোনো সময় হেরেমের সীমার বাইর হতে ইহরাম বেঁধে এসে খোদার ঘরের তওয়াফ করে সাফা-মারওয়ার সাযী করলেই ওমরা হতে পারে। ওমরা করাও ইসলামের একটি অঙ্গ। ওমরা অস্বীকার করা ইসলাম বিরোধী।

৬৫. তওয়াফ করা

হজ এবং ওমরা ছাড়াও খোদার ঘরের তাওয়াফ করা ইসলামের অঙ্গ। তওয়াফকে অস্বীকার করা ইসলাম বিরোধী।

৬৬. ই'তিকাফ করা

ই'তিকাফ করা অর্থাৎ রমযানের শেষভাগে আল্লাহর খাস ঘরে নির্জনে নিরালায় একাকী বসে যাবতীয় ক্রুদ্ধ-গ্লানি ও দুর্বলতা হতে নিজের ভেতর পরিস্কার করে আল্লাহর গুণাবলি নিজের ভেতর আকর্ষণ করাও ইসলামের একটি অঙ্গ। ই'তিকাফকে অস্বীকার করার অর্থ, কাফিরী ভাবের প্রভাবে ইসলামের একটি অঙ্গকে অস্বীকার করা।

৬৭. শবে কদরে ইবাদত-বন্দেগি বেশি করা

শবে কদরকে তালাশ করা অর্থাৎ রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতসমূহে বেশি করে বন্দেগি করে আল্লাহর খাস রহমত এক হাজার রাতের চেয়েও বেশি ফযীলত হাসিল করার চেষ্টা করা ঈমান ও ইসলামের উন্নতিমূলক কাজ। এটিকে অস্বীকার করার অর্থ কাফিরীভাবে ভাবাপন্ন হয়ে ইসলামের একটি অঙ্গকে অস্বীকার করা।

৬৮. হিজরত করা

নিজের ধর্মকে না ছাড়া, দেশ ত্যাগী হওয়া। যে দেশে, যে সমাজে, যে সংসর্গে থাকলে ধর্ম রক্ষা করা যায় না, ধর্মকে না ছেড়ে দরকার হলে সে সংসর্গ সে সমাজ সে দেশকে পরিত্যাগ করাও ইসলামের একটি অঙ্গ। এটিকেই বলে হিজরত। যদি আর্থিক অবস্থা ভালো বানাতে গেলে বা সম্মান অর্জন করতে গেলে ধর্ম নষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, যেমন— ধোঁকাবাজির জমানায় বা পরাধীনতার যমানায় এ রকম হতে পারে, তবে সে অবস্থায় অর্থ ও সম্মানকে ভুলে কোনো রকমে জীবিকা নির্বাহের কোনো একটি উপায় অবলম্বন করে বড় লোকদের সংসর্গ ত্যাগ করে ঈমান নিয়ে পালিয়ে থাকাও ইসলামের একটি অঙ্গ।

ক্ষণস্থায়ী সুখ-সুবিধা বা স্বার্থ সম্মানের জন্য ঈমান নষ্ট করা বা ভিন্ন সমাজের মধ্যে ভিন্ন জাতির মধ্যে আত্মবিলীন করে দেওয়া বে-ঈমানী।

৬৯, ৭০ ও ৭১. মান্নত, কসম বা কাফফারা পূর্ণ করা

আল্লাহর নামে মান্নত করলে সে মান্নত পূরা করতে হবে। আল্লাহর নামে কসম খেলে কসম পূর্ণ করতে হবে। যদি কসম ভঙ্গ করা হয়, তবে তার

কাফফারা আদায় করতে হবে। এটিও ইসলামের একটি অঙ্গ। অন্যথায় আল্লাহর নামের অবমাননা হবে। আল্লাহর নামের অবমাননা করা কুফরী কাজের অন্তর্ভুক্ত।

৭২. পরিবারবর্গের ভার বহন করা

স্ত্রী-পুরুষের মিলনের স্বাভাবিক ঝোঁক মানুষের মধ্যে সাধারণত আছে। কোন আইন-কানুন ছাড়া এ ঝোঁকের বশীভূত হয়ে চলা পশুত্বের খাসলত। সমাজকে সাক্ষী করে চিরজীবনের তরে সৃষ্টিকর্তার দায়িত্বের বোঝা বহন করার স্বীকারোক্তি করে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ব্যতিরেকে এ ঝোঁকের বশবর্তী হওয়া যাবে না। এ ধরনের বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুরুষের চরিত্র রক্ষা করা এবং স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করা এবং এ উপায়ে সন্তান লাভ করে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করাও ইসলামের একটি অঙ্গ।

যারা এ ভার বহন করার, এ দায়িত্ব পালন করার কষ্টটুকু স্বীকার করতে চায় না, আরামে থাকতে চায় না, বিয়ে-বন্ধন ব্যতিরেকেই পশুর ন্যায় কামরিপু চরিতার্থ বিলাস ভোগ করতে চায় বা পশুর ন্যায় সন্তান জন্মাতে চায় বা হস্তমৈথুন, পুং মৈথুন বা যিনাকারী ইত্যাদি দ্বারা মানবজীবের অপব্যবহার করে, তার ইসলামের বিরোধিতা করে কুফরীকে জারি করতে চায় এবং মানুষজাতিকে মানবতার শ্রেষ্ঠ আসন হতে নামিয়ে পশুত্বের শ্রেণীভুক্ত করতে চায়।

৭৩. সন্তান পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা

পরিবারবর্গের ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণের খরচ বহন করাও ইসলামের একটি অঙ্গ। এ খরচ বহন করার জন্য চেষ্টা পরিশ্রম করা বা এটিকে জ্বালাতন মনে করা অ-ইসলাম।

৭৪. মা-বাপের খেদমত করা

মা-বাপের খেদমত করা ইসলামের একটি প্রধান অঙ্গ। মা-বাপের খেদমত না করা, মা-বাপকে কষ্ট দেওয়া কুফরী কাজ।

৭৫. বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ না করা

বৃদ্ধ-মাতা-পিতাকে কোনো কথায়, কোনো ব্যবহারে কষ্ট দিলে বা বৃদ্ধ মাতা-পিতা অচল হয়ে ঘাড়ের বোঝা হলে বা বৃদ্ধ মাতা-পিতা অন্য ভাই বোনকে বা তাদের ছেলে-মেয়েকে বেশি ভালবাসলে তখন মনের মধ্যে যে বিরক্তি বা বিদ্বেষ ভাবের সৃষ্টি হয় সে বিরক্তি ভাবকে বা বিদ্বেষ ভাবকে দমন করে রেখে প্রাণপণে মা-বাপের খেদমত করে যাওয়া ইসলামের অঙ্গ। বিরক্তি প্রকাশ করা বা

বে-আদবি, গোসতাখি করা, বে-রহমী ভাব দেখানো ইসলাম বিরোধী কাজ ও স্বভাব।

৭৬. সন্তান-সন্ততির লালন-পালন

ছেলে-মেয়ে হলে মা এবং বাপের কর্তব্য হল স্নেহের সাথে তাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ করা এবং দৈহিক, মানসিক ও ইসলামিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধির জন্য যত্নবান হওয়া। এটি ইসলামের একটি অঙ্গ।

ছেলে-মেয়েদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে হবে। পাঁচ-ছয় বছর বয়স হলে নামায শিক্ষা দিতে হবে, কুরআন শরীফ পড়াতে হবে। সাত বছর বয়সে নামাযে খাড়া করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করা ইসলামের অঙ্গীভূত।

ছেলে-মেয়েদেরকে রীতিমত লালন-পালন না করা বা আদব-কায়দা, সভ্যতা শিক্ষা না দেওয়া বা তাদের ধর্ম শিক্ষা না দেওয়া বা তাদের বেকার অকর্মী বানিয়ে রাখা ইসলাম বিরোধী।

৭৭. ছিলাহ রেহেমী

সিলাহ রেহেমী অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ইসলামের একটি অঙ্গ। আত্মীয়তা ছেদন করা কুফরীরা শাখা। আজকাল সাধারণত লোকেরা ধর্মজ্ঞানের অভাবে কুরআনের নির্ধারিত সীমা রেখা ঠিক রাখে না। জ্ঞান ও সংযমের অভাবে মানুষের মধ্যে বিবেক-বিবেচনা, আদল-ইনসাফ ও শরীয়াতের পায়রবি অপেক্ষা ঝোঁক প্রবণতা বেশি (সাধারণত মানুষ একদিকে ঝুঁকে পড়ে) হয় অতি বেশি না হয় অতি কম। মাঝামাঝি ন্যায় ও ধর্মের মধ্যে পথের অনুসরণ কম লোকেই করে থাকে। যদি আত্মীয়তা রক্ষা করতে যায় তবে রাষ্ট্রের এবং প্রতিষ্ঠানের আমানতে খেয়ানত করে স্বজন তোষণের পরিচয় দেয়। আবার যদি স্বজন তোষণ হতে বেঁচে থাকতে বলা হয়, তবে আত্মীয়তা ছেদন পর্যন্ত করে বসে বা হতে বেঁচে থাকতে বলা হয়, তবে আত্মীয়তা ছেদন করে পর্যন্ত করে বসে বা অন্তত লোক যেন তাতেই সন্তুষ্ট হয় বলে বোধ হয়। একজন লোক যদি এক দেশের মন্ত্রী হন বা একটি অফিসের বা একটি স্কুল-মাদরাসার কর্তা হন, তবে হয় তিনি যোগ্যতা সততার মাপকাঠির পরোয়ানা না করেই নিজের স্বজনদের দ্বারা অফিস, মাদরাসা ভরে ফেলবেন, না হয় জনসাধারণ এ চাইবে যে, তাঁর যেন কোথাও স্থান না থাকে। এ দু'পথই ইসলাম বিরোধী পথ। ইসলাম আত্মীয়তা রক্ষা করার আদেশ করেছে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বারা, স্টেট বা আমানতের খেয়ানত দ্বারা নয়; আবার যোগ্যতা-সততা থাকা সত্ত্বেও যে রাষ্ট্র প্রধানের, মাদরাসা প্রধানের পুত্রের বা ভাগ্নে-ভাতিজার কোথাও স্থান হবে না, একথাও

ইসলামের শিক্ষা নয়। যোগ্যতার মাপকাঠিতে, আত্মীয়তার মাপকাঠিতে নয়। যোগ্যতার মাপকাঠিতে তাদের স্থান করে দিলে অনর্থক স্বজন তোষণের দোষারোপ করাও ইসলাম বিরোধী কাজ।

৭৮ ও ৭৯. প্রভুভক্ত ও প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত এবং অধীনস্থদের প্রতি সদয় থাকা

চাকর, দাস-দাসী এবং কর্মচারীদের কর্তব্য প্রভুভক্ততা এবং প্রভুর হিতৈষণা। এটি ইসলামের একটি অঙ্গ। আবার প্রভুর কর্তব্য চাকর, দাস-দাসী এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি সদয় হওয়া, তাদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করা তাদের খায়েরখাহী করা। এটিও ইসলাম এর একটি অঙ্গ। চাকর, দাস বা কর্মচারী হয়ে প্রভুর খেয়ানত করা বা তাঁর সাথে বে-আদবী বা বিদ্ৰোহ করা কুফরীর শাখা। তদ্রূপ প্রভু হয়ে চাকর বা কর্মচারীর সঙ্গে বদমেজাজী করা, দুর্ব্যবহার বা তাদের হিত কামনা না করাও কুফরীর শাখা।

৮০. ইনসাফ ও সুবিচার করা

কোনো রাষ্ট্রের বা কোনো প্রতিষ্ঠানের বা কোনো অফিস-আদালতের বা জনসাধারণের যেকোনো কাজের নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব পেলে আদল ও ইনসাফের সাথে এবং ন্যায়পরায়ণতা ও হিতৈষণার সাথে অধীনস্থবর্গের এবং জনসাধারণের দায়িত্ব পালন করা উচিত। এটিও একটি ইসলামী ফরয।

এ দায়িত্ব পালন না করা, অধীনস্থবর্গের হিত কামনা, হিতের চেষ্টা না করে অন্যায়-অত্যাচার করা বা পদকে গুধু নিজের আরাম-আয়েশের বা অর্থ সংগ্রহের উপায় বানান এবং ক্ষমতার অব্যবহার কুফরীর শাখা।

৮১. একতা শৃঙ্খলা রক্ষা করা

একতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা ইসলামের বড় একটি অঙ্গ। একতা ভঙ্গ করা বা শৃঙ্খলা নষ্ট করা কুফরীর শাখা। অবশ্য বিচার করতে হবে যে, একতা কেমন কাজের যদি কুরআনের বিরুদ্ধে বা রাসূলের বিরুদ্ধে একতা হয়, তবে সে একতাকে ভঙ্গ করাই কর্তব্য। নতুবা যে একতা কুরআন হাদীস তথা শরীয়াতের আদেশের বিরুদ্ধে নয়, সে একতাকে রক্ষা করা ফরয।

৮২. আমীরের আদেশ পালন করা

হিতআতে উলিল আমার অর্থাৎ আমীর বা খলীফার আদেশ পালন করা ইসলামের এক বড় ফরয। যতক্ষণ নেতা পরিস্কার শরীয়তের বিরুদ্ধে আদেশ না

করবে, ততক্ষণ নেতার আদেশ পালন করা ফরয থাকবে। কুরআনের বা রাসুলের স্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে না হলে শুধু ব্যক্তিগত মতের বিরুদ্ধে হওয়ার কারণে নেতার আদেশ লঙ্ঘন করা হারাম ও কুফরীর শাখা, নেতা চাই রাষ্ট্রের নেতা হোক, চাই সৈন্যবাহিনীর নেতা হোক, চাই অফিসের নেতা হোক, চাই মাদরাসার নেতা হোক, চাই দলের নেতা হোক।

৮৩. দু'পক্ষের বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া

সমাজের মধ্যে দু'পক্ষের মধ্যে বা দু'জন লোকের মধ্যে কোন গঙ্গোল বা বিরোধ হলে তা মিটিয়ে দিয়ে বিরোধ দূর করে একতা ও মিল করে দেওয়া ইসলামের একটি ফরয অঙ্গ। এ ফরয পালন করার জন্য অনেক সময় সমাজদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ পর্যন্ত করা ফরয হয়ে পড়ে। বিরোধ না মিটিয়ে বিরোধ পালন করা বা বিরোধ সৃষ্টি করা বা ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামী নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কুফরীর শাখা।

৮৪. সৎকাজে সাহায্য করা

সৎকাজে সাহায্য ও সহানুভূতি করা ইসলামের অঙ্গ। সৎকাজে সাহায্য না করা বা বদকাজে সাহায্য করা কুফরীর শাখা।

৮৫. সৎকাজে আদেশ করা ও বদকাজের নিষেধ করা

সৎকাজের আদেশ করা, উৎসাহ প্রদান করা ইসলামের বিশেষ অঙ্গ। সৎকাজের জন্য চেষ্টা না করা কুফরীর অঙ্গ।

৮৬. বদকাজে নিষেধ করা খারাপ কাজের

প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা ইসলামের একটি অঙ্গ

বদকাজের প্রতি ঘৃণা করা, খারাপ কাজকে খারাপ না বলা কুফরীর শাখা।

৮৭. আল্লাহর আইন জারি করা

মানুষ যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পায় তখন আল্লাহর দেশে আল্লাহর সৃষ্টি জীবের হিতের জন্য আল্লাহর আইন জারি করা তার ওপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এটিও ইসলামের একটি অঙ্গ। ক্ষমতা পেয়ে ক্ষমতর সদ্যবহার না করা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানুষের মনগড়া আইনের দ্বারা মানুষকে শাসন করা কুফরীর শাখা।

৮৮. অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা

ক্ষমতা পেয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে এবং শুধু রাষ্ট্র বা অর্থ বাড়ানোর জন্য যুদ্ধ না করে অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করা বা যারা ন্যায় ও ধর্মের মুপাত করতে উদ্যত তাদের সায়েস্তা করে ন্যায়, ধর্মের ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা ইসলামের একটি অঙ্গ। জিহাদকে অস্বীকার করা অ-ইসলাম। অবশ্য জিহাদ অর্থ শান্তিভঙ্গ ও শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ নয়। সত্য ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিজে সংযম অভ্যাস দ্বারা ইসলামী আখলাকে চরিত্রবান হয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করা, তাতে যদি কেউ বাধা দিতে আসে, তবে সে ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ও প্রাণ নিতে কাপুরষতা না দেখিয়ে সত্যিকার বীরত্ব দেখানো এটিই আসল জিহাদ।

৮৯. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করা

যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই হয়েছে সত্য ধর্মের প্রচার, তাকে বলে ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে পাহারার কাজ করা, দরকার হলে জীবন পর্যন্ত দেওয়া ইসলামের একটি অঙ্গ। এ কাজে অলসতা প্রকাশ করা, দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেওয়া বা কাপুরষতার দেখানো বা অর্থ লোভে বা শত্রুদের তোষামোদে কর্তব্য পালনে ত্রুটি করা কুফরীর শাখা।

৯০. আমানতের হেফাজত করা

আমানতের হেফাজত করা এবং ঠিক অবিকল যেমনটি তেমন রক্ষা করে যার আমানত তাকে পৌছিয়ে দেওয়া ইসলামের একটি প্রধান অঙ্গ। আমানতের খেয়ানত করা কুফরীর শাখা।

৯১. সত্য কথা বলা

কথা যা বলতে হয় সত্য বলা ইসলামের একটি প্রধান অঙ্গ। মিথ্যা কথা বলা কুফরীর শাখা। মিথ্যা মুখে বলাও যেমন কলম দিয়ে লেখাও তেমনই।

৯২ ও ৯৩. করযে হাসানা দিয়ে উপকার করা, ফরয আদায় করা

বিনা সুদে শুধু মুসলমান ভাইয়ের উপকারার্থে সওয়াবের নিয়তে করয দেওয়া ইসলামের একটি অঙ্গ। করয নিলে করয পরিশোধ করাও ইসলামের একটি প্রধান অঙ্গ।

তওফীক থাকা সত্ত্বেও, মুসলমানের কষ্ট দেখা সত্ত্বেও তার কষ্ট দূর করার জন্য একটু সাহায্যও না করা মুসলমানের কাজ নয়। আবার ফরয নিয়ে করয পরিশোধ না করা আরো জঘন্য।

৯৪. পাড়া-প্রতিবেশীর যত্ন নেওয়া

প্রতিবেশীর মর্যাদা রক্ষা করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া, প্রতিবেশী কোন কষ্ট দিলে তা সহ্য করা, প্রতিবেশীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হওয়া, সার কথা হচ্ছে যে, প্রতিবেশীর খাতির করা ইসলামের একটি অঙ্গ। প্রতিবেশীর পক্ষে কুনজর রাখা কুফরীর শাখা।

৯৫. লেন-দেন পরিস্কার রাখা

টাকা পয়সার লেন-দেন পরিস্কার রাখা অর্থাৎ নিজের হক নেওয়ার সময় বেশি না নেওয়া, অপরের হক দেওয়ার সময় কম না দেওয়া এবং অসদুপায়ে আয় না করা, অপব্যয় না করা, সদুপায়ে আয় করতে শ্রম করতে অলসতা অকর্মণ্যতা বা অপমান বোধ না করা, সৎকাজে ব্যয় করতে কুষ্ঠাবোধ না করা, ইসলামের একটি অঙ্গ।

পগালমেলে কারবার করা, অন্যের হক কম দেওয়া, নিজের হক বেশি আনা অর্থাৎ মাপে কম দেওয়া, কারও শ্রমিক হয়ে ন্যায় পরিমাই হতে পরিশ্রম কম করা, কাজে ত্রুটি করা বা মনিব হয়ে শ্রমিকদের সুখ-সুবিধা, সাধ্য-অসাধ্য, স্বাস্থ্য ধর্মের বিবেচনা না করে তাদের দ্বারা বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া, অপব্যয় করা, বিলাসিতা ও অলসতা করা, অভিজাত্য বোধ করা ইত্যাদি অ-ইসলামের শাখা।

৯৬. হালাম দেওয়া ও হালামের জওয়াব দেওয়া এবং ভদ্র ব্যবহার করা

মুসলমান মাত্রকে হালাম করা এবং মুসলমান হালাম করলে তার জওয়াব দেওয়া ইসলামের একটি অঙ্গ। হালামের অর্থ শান্তির দুআ এবং নিরাপত্তা দান। এর জন্য সারা বিশ্বের মুসলমানদের ব্যবহৃত **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** হাদীসের সনদকৃত শব্দ এ সালাম না করা, তার উত্তর **وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ** বা সালামের জওয়াব না দেওয়া বা এ শব্দ পরিবর্তন করে অন্য শব্দ অন্যভাবে ব্যবহার করা ইসলাম বিরোধী।

৯৭. হাঁচির জওয়াব দান করা

মুসলমানের সুখে সুখী হওয়া, দুঃখে দুঃখী হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের একটি কর্তব্য এবং ইসলামের একটি অঙ্গ। মানুষ যখন হাঁচি দেয়, তখন সে মনে একটা আনন্দ পায়। মুসলমান ভাইয়ের এতটুকু আনন্দেও আনন্দিত হওয়া এবং সে যখন আনন্দ পেয়ে **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** বলে আল্লাহর শোকর করে, তখন তাকে আরো

আনন্দিত হওয়ার জন্য **يُرْحَمُكَ اللَّهُ** (তোমার ওপর আল্লাহর রহমত হোক) বলে দুআ দেওয়া মুসলমানের একটি কর্তব্য। মুসলমানের আনন্দে আনন্দিত না হওয়া, মুসলমানের উন্নতি দেখে সুখী না হওয়া, মুসলমানের প্রতিভার কদর না করে আরও তাকে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা ইসলাম বিরোধী কাজ।

৯৮. পরের দুঃখে কষ্ট দূর করা

মানুষের কষ্ট দূর করা, মানুষের দুঃখ মোচন করা, মুসলমানের একটি কর্তব্য এবং ইসলামের একটি অঙ্গ। মানুষের দুঃখে দুঃখিত না হওয়া মানুষের কষ্ট দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করা অ-ইসলাম।

৯৯. নাচ-গান, রঙ-তামাশা, খেলা-ধুলা

নাচ-তামাশা, গান-বাদ্য এবং খেলা-ধুলা বর্জন ইসলামের একটি অঙ্গ। মানুষ মাত্রেরই নাচ দেখার, সিনেমা, তামাশা দেখার, গান-বাদ্য শোনার এবং খেলা-ধুলা করার একটা স্বাভাবিক মনের টান আছে। অথচ মানুষ বোঝে না যে, এসব কাজে কোনোই ফল নেই, বরং পয়সার ক্ষতি, সময়ের ক্ষতি, অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের ক্ষতি, অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক ক্ষতিও হয়, তা সত্ত্বেও মানুষ এসব কাজ শুধু মনের টানে করে। ইসলাম এটাকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের জন্য কিছুটা অনুমোদন করে অর্থাৎ যে পরিমাণে তাদের স্বাস্থ্যের উপকার হয়, পয়সার বা সময়ের অপচয় না হয়, পরিমাণে নৈতিক চরিত্রের কোনো ক্ষতি না হয়, সেই পরিমাণ খেলা-ধুলা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য ইসলাম অনুমোদন করে; কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা নারীদের জন্য কুৎসিত ছবি স্ত্রী-পুরুষেরা একত্রে মেলামেশা বা নাচ, গান-বাদ্য ইসলাম কিছুতেই অনুমোদন করে না, বরং সেসবকে জাতি ও সমাজ ধ্বংসকারী বলে। এসব বিলাস-ব্যসনের কারণেই মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। পরাধীনতার নাগপাশ গলায় পরতে হয়েছিল। এখন ইসলামের দোহাই দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পর পুনরায় সেই লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতা, বিলাসিতা এবং ইসলামদ্রোহিতা আরম্ভ করা হয়েছে, এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

অবশ্য স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যায়ামের উদ্দেশ্য বা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য যেটুকু খেলার দরকার (শরীয়তের কোনো বিধান ভঙ্গ ব্যতিরেকে কোনো ফরয কাজের ক্ষতি না করে) সেটুকু খেলার অনুমতি আছে। এ ধরনের বাদ্যবিহীন গান যাতে বীরত্বের প্রেরণা, জিহাদের প্রেরণা, শত্রুর মোকাবিলায় ছুটে চলার প্রেরণা আছে, ক্ষেত্র বিশেষ সে ধরনের গানের অনুমতি আছে। অল্পসময়ে বেশি শিক্ষা দেওয়ার জন্য বা সামাজিক উন্নয়ন ব্যবস্থা, নৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রচার করার

জন্য বা দেশ-বিদেশের খবর প্রচার করার জন্য, সদুপদেশ বিস্তারের জন্য যদি ফিল্মের সাহায্য বা রেকর্ড-রেডিওর সাহায্য নেওয়া হয় তাতে ইসলাম বাধা দেয় না। কিন্তু জীবের ছবি-বিশেষত কুৎসিত বা কামোদ্দীপক যৌন আবেদনমূলক ছবির আদৌ অনুমোদন নেই। এ যুগে কাফিরদের অনুকরণে ব্যবসা আকারে যে সিনেমা ও ফিল্ম শহরের বাজারে প্রচলিত হয়েছে তা অতিমারাত্মক পাপ। কারণ তাতে স্বাস্থ্য নষ্ট, সম্পত্তি নষ্ট, সময় নষ্ট, সর্বোপরি স্বভাব ও চরিত্র নষ্ট ঘটে থাকে।

উদ্দেশ্যবিহীন খেলা বা বহু আড়ম্বর করে বহু টাকা-পয়সা খরচ করে বহু দূরের লোকের কাজের ক্ষতি করে পয়সার অপব্যয় করে প্রতিযোগিতা করে খেলা ইসলাম অনুমোদন করে না। এসব মনের ঝাঁককে দমিয়ে থামিয়ে রাখা ইসলামের একটি অঙ্গ।

বর্তমান যুগে অমুসলিমদের অনুকরণে খেলা-ধুলার জন্য যে ধরনের অতিরিক্ত আড়ম্বর করা হচ্ছে, সময়, সম্পদ ও সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। বিশেষত মেয়েদের প্রকাশ্য প্যারেড, প্রকাশ্য খেলা-ধুলা, রঙ-তামাশা, নাচ ইত্যাদি শুধু ইসলাম বিরোধীই নয়, বরং কোনো সুরচিসম্পন্ন জ্ঞানী মানুষের দ্বারাই এটা অনুমোদিত হতে পারে না। এ ধরনের মনের ঝাঁককে দমিয়ে না রেখে অন্যান্য লোকের দেখাদেখি শ্রোতে ভেসে যাওয়া বা এ ধরনের কাজ ও অনুষ্ঠানের এবং Fine art-এর উন্নতি হল না বলে আফসোস করা অ-ইসলাম। এ ধরনের উন্নতিতে যা প্রকৃতপ্রস্তাবে মানবতার উন্নতি নয়, বরং অবনতির এবং ধ্বংসের পূর্ব লক্ষণ, ইসলাম এতে সব সময় বাধা দেবে। অন্য লোকেরা গোঁড়া বলবে, মোল্লা বলবে, প্রতিক্রিয়াশীল বলবে তাতে Inferiority Complex মনে আসার মতো দুর্বলচেতা ভাবের অনুমোদন ইসলাম করে না।

১০০. রাস্তা-ঘাট পরিস্কার রাখা

রাস্তা-ঘাট হতে কাঁটা, পাথর, ময়লা ইত্যাদি লোকের কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দিয়ে রাস্তা-ঘাটকে পরিস্কার রেখে লোকের কষ্ট দূর করা ইসলামের একটি অঙ্গ। রাস্তায় কাঁটা ছড়ানো বা রাস্তায় পথিকদের কষ্টদায়ক জিনিস রাখা, রাস্তা-ঘাটে বা গাছের পাতায় পায়খানা ফিলে লোকদের কষ্ট দেওয়া ইসলাম বিরোধী কাজ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হাফেয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী শরীফের শরাহ সুপ্রসিদ্ধ ফতহুল বারী

নামক কিতাবে উল্লিখিত ১০০ শাখাসমূহকে একত্রিত করে দেখিয়েছেন। কুরআন-হাদীস সূত্রে আরও কিছুসংখ্যক শাখা-প্রশাখার খোঁজ পাওয়া যায়, অবশিষ্টাকারে সেসবও একত্রে সমাবেশ করে দেওয়া হল:

১. মুসলমান ছেলেদের সাত হতে বার বছরের মধ্যে খাতনা করিয়ে দেওয়া ইসলামী আদর্শ। খাতনা না করানো কাফিরী আদর্শ।
২. মুসলমান ছেলেরা যখন যৌবনপ্রাপ্ত হয় তখন ইসলামী আদর্শ হিসেবে তাদের একটি কর্তব্য হচ্ছে যে, নাতীর নীচে যে পশম জ্বালায় তা পরিস্কার করে রাখতে হয়। তা পরিস্কার না করে বর্ধিত আকারে থাকতে দেওয়া অসভ্যতা এবং কাফিরী আদর্শ।
৩. তাদের ওপর আর একটি কর্তব্য হচ্ছে যে, উপরের ঠোঁটের ওপর যে পশম জ্বালায়, যাকে মোচ বলে, তাকে এত বাড়তে দেবে না যে, এর দ্বারা উপরের ঠোঁট ঢেকে যেতে পারে; বরং তা খাঁট করে রাখবে। এটিই ইসলামী আদর্শ, মোচ লম্বা করা ইসলামী আদর্শ বিরোধী।
৪. তাদের ওপর একটি কর্তব্য হচ্ছে যে, তাদের মুখমণ্ডলে ক্রমান্বয়ে যে পশম জ্বালায় মুখের সৌন্দর্য বর্ধন করতে থাকে, যাকে দাড়ি বলে তা কাটবে না, বরং পুরুষত্বের এবং গাষ্ট্রীয় বর্ধনস্বরূপ তা পরিপাটি করে রেখে দিতে হয়। পুরুষের মুখে দাড়ি রাখা ইসলামী আদর্শ, দাড়ি না রাখা কাফিরী আদর্শ। যাদের মধ্যে হীনতাবোধ এবং বিজাতীয় অনুকরণ প্রিয়তার দুর্বলতা না চুকেছে তারা নিজেদের জাতীয় আদর্শ পালন করতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না।
৫. মুসলিম যুবকের ওপর আর একটি কর্তব্য হচ্ছে যে, বগলে যে পশম জ্বালায় তা আন্তে আন্তে উপড়িয়ে ফেলে দিতে হয়, তা লম্বা করে রাখা বড়ই অসভ্যতা এবং কাফিরী তরীকা। সেই পশম পরিস্কার করে ফেলে দেওয়া ইসলামী আদর্শ।
৬. মুসলমান মেয়েরা যখন যৌবনের নিকটবর্তী হয় অর্থাৎ যখন তাদের সৌন্দর্য ফুটে বের হয়ে পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আরম্ভ করে তখন হতে আর তাদের সৌন্দর্য পর পুরুষকে দেখতে দেওয়া যাবে না। এটি স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ, কুরআনের পরিস্কার আদেশ। অতএব এ নিষেধাজ্ঞা অতিকটোরভাবে প্রত্যেক মুসলিমের পালন করতে হবে। এটিই ইসলামী আদর্শ, নতুব স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য পুরুষজাতিকে অবাধে ভোগ করতে দিয়ে নারীজাতির সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান সম্পদ সতীত্ব নষ্ট হতে দেওয়া এবং পুরুষজাতির চরিত্রকে সঙ্কটের সম্মুখীন করা ইসলাম কিছুতেই সমর্থন করে না।

কাফিরগণ ব্যতীত যুবক-যুবতীদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে কেউই প্রশ্রয় দিতে পারে না। পর্দা-ফরযকে পালন করার মধ্যেই নারীজাতির প্রকৃত

মর্যাদা, এটি শুধু ধর্মীয় ফরযই নয়, মনুষ্যত্বের এবং সভ্যতারও এটি প্রধান অঙ্গ। যুবতী নারীদের পর্দা-ফরয পালন করাই ইসলামী আদর্শ। এর বিপরীত কাফিরী আদর্শ।

৭. সভা ক্ষেত্রে, অফিস-আদালতে, বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে, রাজ-দরবারে বা মসজিদে, খানকায় যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা করার সুযোগ দান করা ঘোর ইসলাম বিরোধী তরীকা। এর দ্বারা যুবক-যুবতীদের নৈতিক চরিত্র ও মনুষ্যত্বের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। কর্মক্ষেত্রেও পৃথক পৃথক করতে হবে, নতুবা মানবতা ধ্বংস হয়ে যাবে, মানুষ পশুত্বের স্তরে নেমে যাবে। নারীজাতির জন্য ভিন্ন কর্মক্ষেত্র সাব্যস্ত করা, নারীকে সর্বসাধারণের ভোগ্য বস্তুতে পরিণত না করে নারীকে একমাত্র তার স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী অন্তরঙ্গ বান্ধবীর মর্যাদা দান করাই ইসলামী আদর্শ। এর বিপরীত নারী-পুরুষকে অবাধ মেলা-মেশা করতে দিয়ে নারীকে সাধারণ ভোগ-বিলাসের বস্তুতে পরিণত করা নারীজাতির মর্যাদা হানিকর, এটা কাফিরী তরীকা।
৮. মানুষের মধ্যে যত রকমের উত্তেজনা আছে, এর মধ্যে যৌনউত্তেজনাই সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে দুর্দমনীয় ও সবচেয়ে মূল্যবান। মূল্যবান এজন্য যে, এর দ্বারা মানুষের ঘরে মানুষ পয়দা হয়। এই উত্তেজনাকে দমন করার জন্য কত খ্রিস্টান পাদরির, কত হিন্দুর মহাশুররা মিথ্যা ভান করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরও লম্পটতা প্রকাশ পেয়েছে এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কমিউনিস্টরা মানুষকে একেবারে পশুত্বেরই স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। এজন্যই এ দু'দিককার চরমপন্থীদের মধ্যপন্থী হযরত মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর নির্দেশ সজোরে ঘোষণা করে গেছেন,

«النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

‘নারী-পুরুষের সামাজিক জোড়াবন্ধনের দ্বারা বিবাহিত জীবন যাপন করে মানবোচিত চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা, নারী জাতির সতীত্ব রক্ষা করা, যৌন উত্তেজনাকে শুধু পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা হিসেবে ব্যবহার না করে সৃষ্টির সেরা মানববংশ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা, বরং তারও উর্ধ্বে উঠে তা দ্বারা স্রষ্টার সঙ্গে প্রেম করার প্রেরণা লাভ করাই আমার আদর্শ, আমার আদর্শকে যারা অবজ্ঞা করবে, তারা আমার উম্মতভুক্ত থাকতে পারবে না।’^১

অতএব প্রমাণিত হল যে, বিবাহিত সীমাবদ্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করা ইসলামী আদর্শ। আর বিয়ে না করে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করা কাফিরী তরীকা।

^১ ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৫৯২, হাদীস: ১৮৪৬, হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

৯. শিশুসন্তান জন্ম হওয়ার পরক্ষণেই তাকে পাক করে তার ডান কানে আযানের শব্দসমূহ শুনিয়ে দিয়ে তাকে আল্লাহর সোপর্দ করে রাখা ইসলামী আদর্শ। এছাড়া নাস্তিক যারা কিছু জানে না, কিছুই করে না, শুধু প্রসূতির এবং শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে থাকে। যারা মূর্তিপূজক বা দেবতাপূজক মুশরিক, তারা হয়তো তাদের দেবতার নাম নেয় কিন্তু ইসলামী আদর্শ হচ্ছে যে, শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার নৈতিক আত্মার স্বাস্থ্য যাতে ঠিক থাকে তারও সূচনা করতে হবে এভাবে যে, সর্বপ্রথম শব্দ যেন আল্লাহর, রাসূলের, কালিমার শব্দ, আযাবের শব্দ, জীবনের কামিয়াবির শব্দ যেন শিশুর কানে প্রথম পৌঁছে। কারণ শিশুর মস্তিষ্ক এখন ক্যামেরার মতো। সে মস্তিষ্কে যা কিছু প্রথমে পৌঁছে দেওয়া যাবে তা নকশার মতো হয়ে জমে থাকবে।

১০. ছেলে-সন্তান যাবৎ নাবালেগ থাকে তাদের মাথার চুল মুন্সিয়ে ফেলানোই সর্বোত্তম। তারা যখন যৌবন প্রাপ্ত হয় তখন মাথার চুল মুন্সিয়েও ফেলতে পারে, মাথার চুল কান পর্যন্ত বা কাঁধ পর্যন্ত যোলফ বা বাবরী আকারে রাখতেও পারে বা আগে পাছে সমান ছেটে খাটো করেও রাখতে পারে, এটি ইসলামী তরীকা বা ইসলামী আদর্শ। কিন্তু আজকাল যে ইংরেজদের অনুকরণে পাছের চুল খাটো করে শুধু সামনের চুল লম্বা করে রাখা হয় তা ইসলামী তরীকা নয়। অথবা কোনো কোনো ফকীর যে হিন্দু সন্ন্যাসীদের অনুকরণে মেয়ে লোকদের মতো অনেক লম্বা চুল রাখে তাও ইসলামী তরীকা নয়।

১১. মেয়েরা যখন নাবালেগা ছোট থাকে তখন তাদের মাথার চুল মুন্সিয়ে ফেলাও যেতে পারে, কিন্তু যখন তারা বেশ একটু সেয়ানা হয়, ৮/৯ বছরের হয় তখন হতে তাদের মাথার চুল আর মুন্সানো বা ছাঁটা চাই না, সম্পূর্ণ চুল লম্বা করে রাখা চাই। মেয়েদের চুল লম্বা করে রাখাই ইসলামী আদর্শ। আজকাল খ্রিস্টানদের অনুকরণে কিছু মেয়েদের চুল ছেটে খাটো করে পুরুষদের বাবরী যোলফের মতো রাখা হয়, তা ইসলামী তরীকা নয়, খ্রিস্টান কাফিরদের তরীকা।

১২. মেয়েদের মাথার চুল ঢেকে রাখা ইসলামী তরীকা। পরপুরুষ মুসলমান মেয়েদের মাথার চুল দেখবে অথবা বুক উঁচু দেখবে, এর চেয়ে ঘৃণার কথা আর কিছুই নেই। আজকাল খ্রিস্টান কাফিরদের অনুকরণে কোন কোন মুসলমান নামধারী মেয়েলোকও মাথার চুল খোলা রেখে পরপুরুষকে দেখায়, এটি অত্যন্ত ঘৃণা এবং লজ্জার বিষয়। যদি মেয়েদের বুক উঁচা পরপুরুষের দেখতে পায় এমন জঘন্য কাজ হতে প্রত্যেকটি মুসলিম নারীর বেঁচে থাকা একান্ত দরকার।

১৩. স্ত্রীর সৌন্দর্য একমাত্র তার স্বামী দেখার অধিকারী, তাছাড়া অন্য কাউকে সে সৌন্দর্য দেখানো অত্যন্ত জঘন্য কাজ। এটাই ইসলামী আদর্শ। স্ত্রীর সৌন্দর্য অন্য পুরুষকে দেখা বা স্ত্রীর সুর অন্য পুরুষকে শোনা এসব কাফিরী তরীকা।

১৪. টাখনার গিরা ঢেকে ফেলে এভাবে ফুলপ্যান্ট পরা বা হাঁটু খোলা হাফ প্যান্ট পরা ইসলাম বিরোধী তরীকা। হাঁটু ঢাকা হাফ প্যান্ট জরুরতবশত পরা যাবে, কিন্তু হাফ প্যান্ট মেয়ে-ছেলেদের পরা আদৌ সঙ্গত নয়।

পুরুষের পোশাকের জন্য সীমারেখা হচ্ছে, টাখনার গিরা ঢাকা না হওয়া চাই, হাঁটু খোলা না হওয়া চাই, নিম্ন শরীর দেখা যায় এমন পাতলা না হওয়া চাই, রেশম না হওয়া চাই, বিজাতীয় ফ্যাশনের অনুকরণ না হওয়া চাই, এ সীমারেখার ভেতরকার একটি ইসলামী আদর্শ পোশাক আচকান পায়জানা ও টুপী।

মেয়েলোকের আদর্শ ইসলামী পোশাক হচ্ছে, পায়ের পাতা ঢাকা পায়জামা মাথা ঢাকা উড়না, পুরা আঙ্গিনের হাঁটু ঢাকা, গলা ঢাকা, বুক ঢাকা জামা, বুক ঢাকার আরও একখানা কাপড় হলে ভালো হয়। বাইরে যেতে হলে মুখে ঢাকা বড় চাদর বা বোরকা।

১৫. পুরুষের জন্য টুপি না পরা অনৈসলামীক তরীকা, এটা বর্জনীয়। মুসলমানের মাথায় টুপি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

১৬. বিছানায় দস্তরখানা পেতে বিসমিল্লাহ বলে ডান হাত দিয়ে খাওয়া ইসলামী তরীকা। বাম হাত দিয়ে খাওয়া বা খাড়া হয়ে পশুর মতো খাওয়া খাড়া হয়ে পশুর মত পেশাব করা ইসলামী বিরোধী তরীকা।

১৭. সতর ঢেকে রাখা ইসলাম তরীকা। লোকসমক্ষে বা শয়নের সময় বা খোলা স্থানে গোসলের সময় সতর ঢেকে রাখা ইসলামী ফরয। অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর নির্জন কক্ষে কোনই সতর নেই। কোনো কোনো সভ্যতাভিমानी দেশে যে, উলঙ্গ হয়ে লোক সমক্ষে গোসল করে, তা অসভ্যতা বই নয়। সতর বলে শরীরের কুৎসিত অংশকে অর্থাৎ পুরুষের নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখাকে।

১৮. সকালে সূর্যোদয়ের সওয়া ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পূর্বে সুবহে সাদেকের পবিত্র মুহূর্তে ঘুম হতে উঠা এবং ঘুম হতে উঠে হাজত জরুরত পুরা করে পাক পবিত্র হয়ে ফজরের নামায মসজিদে জামায়াতে পড়ে আল্লাহর কাছে সব কাজের জন্য মদদ চাওয়া, আল্লাহর কাছে সব বিপদ আপদ হতে হেফাজত চাওয়া এবং কিছু পরিমাণ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, ছেলেমেয়েদেরকে মসজিদে কুরআন শরীফ পড়ার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া

ইসলামী তরীকা এবং ইসলামী আদর্শ। এর বিপরীত সূর্যোদয়েরও শোয়া ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পরে ৮টায় ঘুম হতে উঠা ইসলাম বিরোধী বা কাফিরী তরীকা।

১৯. জুমুআর দিন মুসলমান জাতির সাপ্তাহিক ঈদের দিন। এ দিনে বিশেষ-ভাবে বাড়ি-ঘর, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়। সকাল সকাল গোসল করে জুমুআর নামাযের জন্য সকল মুসলমানের মসজিদে যেতে হয় এবং মসজিদে গিয়ে সে দিন অন্যদিনের তুলনায় ইবাদত-বন্দেগি কিছু বেশি করতে হয়, কুরআন শরীফ ও দরুদ শরীফ বেশি পড়তে হয়, নেকলোকের সুহবতে বসে কিছু উপদেশ গ্রহণ করতে হয়, আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ কিছু বাড়তে হয়। কিন্তু ওয়ায-নসীহত শুনতে হয়। এজন্য অন্তত জুমুআর আগ পর্যন্ত দোকান-পাট, অফিস-আদালত, মাদরাসা-মকতব, স্কুল-কলেজ ও ক্ষেত-খামারের কাজ-কাম বন্ধ রাখতে হয়, নতুবা জুমুআর নামাযের ক্ষতি হয়। কেননা সপ্তাহে একদিন অন্তত মুসলমানের ধর্ম চর্চায় একে অন্যের সঙ্গে মিল-মুলাকত, আলাপ-আলোচনা ও অনুশীলন-গবেষণা হওয়া দরকার। এজন্য পূর্ণ জুমুআর দিনই মুসলমানদের ছুটির বলে পরিগণিত হয়। পক্ষান্তরে রবিবার খ্রিস্টানদের সাপ্তাহিক গির্জায় যাওয়ার দিন। মুসলমানদের নিজেদের ইসলামী আদর্শ ছেড়ে খ্রিস্টানদের আদর্শের অনুকরণ করা বড়ই নীচতার কথা এবং বড়ই আফসোসের বিষয়।

২০. মুসলমানদের কোনো ঘরেই ইসলাম প্রচারের এবং ইসলামী শিক্ষা জারি করার কিছু প্রচেষ্টা হতে বিরত থাকা উচিত নয়। এ মহান কাজের উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে অন্তত একজন আলেম তালেবে ইলম জায়গীর রাখা সুন্নত। অতি পুরাতন জমানা হতে চলে আসছে, যাতে মেয়ে-ছেলেরাও পর্যন্ত আযানের আওয়ায ইসলামের বাণী কুরআনের ঝঙ্কার শুনতে ও শিখতে পারে এবং কথঞ্চিৎ ইসলামের খেদমতের মধ্যে থাকতে পারে। এ সুন্নত পরিত্যাগ করা ইসলামের শত্রুদের বিশেষত ইংরেজ খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের ফল। নতুবা প্রত্যেক মুসলমানেরই কুরআন-হাদীসের সঙ্গে খোদা-রাসুলের সঙ্গে, মসজিদ-মাদরাসা ও মক্তবের সঙ্গে আন্তরিক মুহাব্বত আছে এবং হওয়া চাই। এ ধরনের মেহমানের খেদমত করা বিশেষত বিশিষ্ট মুসলমান আলেম, তালেবে ইলম, ইসলাম প্রচারক মেহমানের খেদমত করা প্রত্যেক মুসলমানের সঙ্গে হামদর্দি রাখা এটি ইসলামী তরীকা, নতুবা টাকা নিয়ে জায়গীর রাখা বা জায়গীর আদৌ না রাখা, মেহমানের খোঁজ-খবর না নিয়ে বা মুসলমানের কষ্ট শুনে দেখে হামদর্দি প্রকাশ না করা, দুঃখিত না হওয়া এটা ইসলামী তরীকা নয়, ইসলাম বিরোধী তরীকা।

২১. করব যিয়ারত করা অর্থাৎ কবরস্থ মুসলমানকে **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ** বলে সালাম করা এবং সূরা আল-ফাতিহা একবার, সূরা আল-ইখলাস তিনবার

পড়ে তার সওয়াব কবরস্থ ব্যক্তিকে পৌছে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ইসলামী তরীকা। অথবা গরীব দুঃখী-অভাবীদের কিছু দান করে এর সওয়াবও কবরস্থা মৃতব্যক্তিকে দান করা যায়। এছাড়া কবরস্থ মৃত ব্যক্তির নিকট হাজত চাওয়া, ওয়ালী আল্লাহর কবরই হোক না কেন কিছুতেই ইসলাম অনুমোদন করে না। এভাবে কবরের ওপর ফুল পড়ানো, চাদর চড়ানো, বাতির জ্বালানোও ইসলামে নেই। ঠগ লোকেরা জনসাধারণকে ফাঁকি দিয়ে কিছু রোযগার করার জন্য এ ধরনের ইসলাম বিরোধী তরীকা জারি করেছে। সারকথা হচ্ছে যে, কবরের কাছে কিছু চাওয়া চাই না, বরং দেওয়া চাই এবং মেয়েলোকদের কবরের কাছে যাওয়া চাই না।

২২. সুদের ভিত্তিতে ব্যাংক জারি করা একটা ইসলাম বিরোধী তরীকা। লাভের অংশের ভিত্তিতে ব্যাংক জারি করে সেটা ইসলামী ব্যাংক হতে পারিত। ইসলামী হুকুমতের সেইরূপ করা উচিত।

২৩. অতিরিক্ত ট্যাক্স বসানো ইসলামী তরীকা নয়। প্রত্যেকেই তার অর্জিত অর্থের মালিক। মালিকের মর্জি ব্যতিরেকে তার কাজ ব্যতিরেকে তার পয়সা জোর করে হরণ করা বড় অন্যায়, বড় অত্যাচার। অবশ্য মালদারের কর্তব্য গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করা, ইসলামী শিক্ষা জারি করার কাজে, ইসলাম প্রচারের কাজে সাথহে দান করা, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা যালেমদের দ্বারা তাদের ওপর যুলুম করাবেন। ফল এ হবে যে, নিজ খুশিতে ধর্মের কাজে দান করলে তার প্রতিদান বহুগুণে বেশি আখিরাতে পেত। কিন্তু যালেমের যুলুমে দান করলে তার প্রতিদান কিছুই পাবে না।

২৪. জুয়া খেলা, তাস, পাশা, লুডু, ঘোড়দৌড় তথা রেস ইত্যাদি খেলা ইসলাম বিরোধী তরীকা। এসব ইংরেজদের আমদানীকৃত অপকর্ম। জুয়া খেলার লাইসেন্স দেওয়া আরও অধিক অহিত।

২৫. শরাব-মদ পান করা ইসলামী তরীকা নয়। ওষুধ হিসেবেও শরাব ব্যবহার করা জায়েয নেই।

২৬. শোয়োর অত্যন্ত ঘৃণিত জানোয়ার। এর কোনো অংশই কোনোভাবে ব্যবহার করার অনুমতি ইসলামে নেই। খ্রিস্টানরা শোয়োর খায়। ইসলাম ধর্মে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ।

২৭. যেসব জানোয়ার হালাল যেমন- গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি। এসব জানোয়ারও তখনই হালাল হবে যখন আল্লাহর নামে যবেহ করা হবে। আল্লাহর নামে যবেহ করা না হলে অথবা গুলির চোটে মরে গেলে বা মোচড়ো ছিড়ে ফেললে তা হারাম হয়ে যাবে, হালাল হবে না। অতএব কোনো জীবের গোস্ত আল্লাহর নামে যবেহ না করে খাওয়া ইসলামী তরীকা বিরোধী।

২৮. মুসলমানদের ছেলে-মেয়েদের সর্বপ্রথম কুরআন শিক্ষা দিতে হবে। তারপর ঈমান ও ইসলামের জ্ঞান দান করতে হবে, তারপর নামায, রোযা, ওয়াযু-গোসল, হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, জায়েয, না-জায়েয শিক্ষা দিতে হবে। এইরূপ না করে প্রথমেই শিশুদের খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া ইসলামী তরীকা নয়। এটি খ্রিস্টানদের তরীকা, অতিমারাত্মক কাজ।
২৯. ক্রুশ চিহ্ন ধারণ পরা খ্রিস্টানদের তরীকা।
৩০. মাথায় হ্যাট পরা খ্রিস্টানদের তরীকা।
৩১. গলায় নেকটাই বা ক্রুশ চিহ্নেরই প্রতীক, এটা খ্রিস্টানদের তরীকা।
৩২. বসে পেশাব করা ইসলামী অভ্যাসের তরীকা। খাড়া হয়ে পেশাব করা অসভ্য জানোয়ারদের তরীকা। পেশাব করার সময় আড়াল জায়গায় বসে কা'বা শরীফের দিক মুখ বা পিঠ না করে পেশাব করা ইসলামী তরীকা।
৩৩. বসে পায়খানা করে পানি দিয়ে না ধোয়ে শুধু কাগজ দিয়ে মুছে রাখা ইসলাম বিরোধী তরীকা, অধিকন্তু পেশাবের ফোঁটা আসা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত টিলা-কুলুখের ব্যবস্থাবলম্বনে ফোঁটা আসা শেষ করে নেওয়া চাই। ইসলাম আমাদেরকে পূর্ণ পবিত্রতা শিক্ষা দিয়েছে।
৩৪. স্ত্রী-সহবাস করে গোসল করা ফরয, এটি ইসলামী আদর্শ। গোসল না করা ইসলাম বিরোধী তরীকা।
৩৫. বেহায়া হওয়া, বে-আদব, বে-তমীয হওয়া, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা, বড়দের মান্যতা না করা এসব ইসলাম বিরোধী নাস্তিকতার প্রভাব। আইনের বেলায়, বিচারের বেলায় সকলের সমান অধিকার, কিন্তু ব্যবহারের বেলায় সব সমান নয়। শাগরেদ হলে উস্তাদের মান্যতা করতে হবে, স্ত্রী হলে স্বামীর মান্যতা করতে হবে, নিম্নস্থ কর্মচারী হলে অফিসারের মান্যতা করবে; সঙ্গে সঙ্গে অফিসারদেরও নিম্নস্থ কর্মচারীদের স্নেহের চোখে দেখতে হবে, এটিই ইসলামী তরীকা। এর বিপরীত ইসলাম বিরোধী নাস্তিকতার তরীকা।
৩৬. ধার্মিক হলে, পরহেযগারী অবলম্বন করলে, আলেম হলে, হাজী হলে, পীর হলে বা শিক্ষিত হলে, সাংসারিক কাজ, শিল্পকাজ, ব্যবসার কাজ, কৃষি কাজ করা যাবে না, করলে অপমান হবে, এ ধারণা একবারে ভুল ধারণা। এটা ইসলামী তরীকা নয়। ধর্মের সঙ্গে কর্মের উন্নতি করার বিরোধ নেই, বরং অসদুপায়ে কর্ম না করার যে আদেশ ধর্মে রয়েছে তার পরীক্ষা হয়ে ঈমান এবং কর্ম পরিপক্ব হবে কর্মক্ষেত্রে। যেমন— ধর্মের আদেশ সত্য কথা বলা, আমানতদারী করা, চরিত্রকে পবিত্র রাখা, কর্কশ বা কটু কথা না বলা, পরনিন্দা না করা, পক্ষপাতমূলক বিচার না করা, গরীবের প্রতি, অভাবীর প্রতি দরদ দেখানো, শত কাজে ব্যস্ত থেকেও আল্লাহকে না ভোলা, আল্লাহর হুকুমের খেলাফ না করা, ধৈর্যধারণ করা, প্রত্যেকটি হকদারের হক আদায়

করা ইত্যাদি। এসব গুণের পরিপক্বতা লাভ হবে এবং পরিপক্বতা প্রমাণিত হবে দুনিয়াদারীর কাজের মধ্যে থেকেই।

৩৭. আরব-আজম, সাদা-কালো, ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র, নির্বিশেষে ইসলাম এক বিশ্ব-মুসলিম জাতিত্ব এবং বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিল, এটিই ছিল ইসলামী আদর্শ। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, ইসলামের শত্রুদের গোপন শত্রুতামূলক প্ররোচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহও রাষ্ট্রভিত্তিক জাতিত্ব স্থাপন করেছে। এটা ইসলাম বিরোধী এবং মুসলিমজাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

৩৮. ইসলামী সমাজব্যবস্থার ভিত্তি রাখা হয়েছে দায়িত্ব চেতনার ওপর। এজন্যই ইসলাম আমাদের অধিকারের প্রশ্নের চেয়ে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছে অনেক বেশি, এটিই ছিল ইসলামী আদর্শ এবং এতেই ছিল শান্তি। কারণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে আপন দায়িত্ব পালন করলে প্রত্যেকেরই প্রাপ্য ও অধিকার শান্তির সাথে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমানে দুনিয়া দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ না করে অধিকারের প্রশ্ন তুলে দেয়, এতে আসে ঝগড়া ও অশান্তি।

৩৯. ইসলাম বিচারের বেলায় তো সমান অধিকার দিয়েছে, কিন্তু নারী ও পুরুষকে সমান করে দেয়নি। নারীকে নারীর দায়িত্ব দিয়েছে, পুরুষকে পুরুষের দায়িত্ব দিয়েছে। একজন নারী এবং একজন পুরুষ এ দু'জন মিলে একটি পূর্ণ মানুষ হয়। নারীদের পৃথক একটি শ্রেণী করে শ্রেণিযুদ্ধের সুযোগ ইসলাম দেয়নি। ইসলাম প্রত্যেকটি পুরুষকে তার স্ত্রীর প্রতি, মাতার প্রতি, কন্যার প্রতি দায়িত্ব পালনের কঠোর আদেশ করেছে এবং স্ত্রীকে তার স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হয়ে থেকে স্বামী সেবা ও সন্তান পালন করে সমাজের ভিত্তি ঠিক করে দেওয়ার আদেশ করেছে। নারীকে সর্বসাধারণের ভোগ্যবস্তু হতে দেয়নি। নারীদের যদি কোথাও পুরুষদের জামায়াতে আসতে হয়, তবে মুখ আবৃত রেখে একপাশে পিছনের কাতারে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। এটিই শান্তি, এটিই ইসলামী আদর্শ। এর বিপরীত অনৈসলামিক আদর্শ। দুনিয়ার অশান্তি ও মানবজাতির ধ্বংসের কারণ। নারী ও পুরুষ সমান হতে পারে না। যারা সমান হওয়ার বুলি আওড়াচ্ছে বা নারী স্বাধীনতার ধূয়া তুলেছে তারাও মিথ্যা কথা বলে ধোঁকা দিয়ে নারীকে রাণীকে সর্বসাধারণের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করেছে এবং মাতৃজাতির মর্যাদাহানি করেছে।

৪০. বিয়ের বেলায় অর্থাৎ নারী-পুরুষের জোড়া বাঁধার সময় ইসলাম গোপন প্রেম বা অবৈধ সিভিল ম্যারিজ, নারীর অসভ্য বর্বর ম্যারিজ জায়েয রাখেনি। প্রকাশ্য সভায় জোড়া বাঁধার কড়া আদেশ দিয়েছে। জোড়া বাঁধার পূর্বে গোপন প্রেম করলে তাকে একশত কোড়ার শাস্তির যোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৪১. বিয়ের সময় পুরুষের যিম্মায় দায়িত্ব চাপানো হয়েছে, প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ জীবনের দায়িত্ব বহনের যোগ্যতার স্বরূপ স্ত্রীকে মহর দিয়ে বিয়ে করবে। এটিই ইসলামী আদর্শ এবং স্বভাব-ধর্মের অনুযায়ী ব্যবস্থা। অধুনা হিন্দুদের দেখাদেখি জ্ঞানহীন শিক্ষিত সমাজের ভেতর যে কুপ্রথা চালু হয়েছে যে, বরকে টাকা-পয়সা দিয়ে কন্যাদান করতে হবে। এটি অতিমারাত্মক কুপ্রথা, নারীজাতির মাতৃজাতির অমর্যাদার সর্বনিম্ন স্তর। এতে পুরুষ জাতিরও পরিণামে অশান্তি। কলিজার টুকরা একটি মেয়েকে ১৩/১৪ বছর পর্যন্ত পেলে-পুষে পরকে দিতে হবে তাতেও আবার আরও টাকা-পয়সা দিয়ে দিতে হবে এর চেয়ে অবিচার আর কি হতে পারে?
৪২. ইসলাম আয় করার দায়িত্ব, শাসন করার দায়িত্ব রেখেছে পুরুষের ওপর, নারীকে কঠোর কাজের দায়িত্ব না দিয়ে সহায়করূপে কোমল কাজের দায়িত্ব তাকে দিয়েছে। এটি নারীর জন্য পরাধীনতা নয়, বরং বন্ধুত্বমূলক আপোষের মিল এবং শৃঙ্খলার অনুবর্তিতা। পুরুষ বাইরে থেকে কঠোর পরিশ্রম করে কামাই করে আনসে, স্ত্রী বিশ্বস্ত হয়ে ঘরের রানি হয়ে মালিক হিসেবে সব সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করবে। এর চেয়ে ভালো এবং সুন্দর ব্যবস্থা আর হতে পারে না।
৪৩. খেলার স্থান খেলাকে দিতে হবে কাজের স্থান কাজকে দিতে হবে। খেলাকে অত্যাদিক গুরুত্ব দেওয়া বিবেকসঙ্গতও নয়, ইসলাম সমর্থনীয়ও নয়। বীরত্ব চর্চার জন্য এবং শরীর চর্চার জন্য কিছু খেলার দরকার আছে, কিন্তু তা কাজের ভেতর দিয়ে করাই শ্রেয়। বৃথা সময় ও সম্পদ নষ্ট করে নয় বা চরিত্র নষ্ট করে নয়। কেননা চরিত্রের মূল্য স্বাস্থ্যের চেয়ে অনেক বেশি। মানুষের জীবনে আনন্দেরও প্রয়োজন আছে সত্য, কারণ আনন্দের দ্বারাও স্বাস্থ্য ভালো থাকে, মনে স্কুর্তি আসে, কিন্তু তুলনা করে দেখতে হবে যে, কোনটির মরতবা কতখানি? কোনটির স্থান কোথায়? চরিত্রের স্থান স্বাস্থ্যের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। আনন্দ প্রকাশের জন্য উৎসব করতে গিয়ে যদি চরিত্র কুলষিত হয় অথবা পরানুকরণের ন্যায় হীনতার ক্ষতিপূরণ হাজার স্বাস্থ্যের দ্বারাও হতে পারবে না। মনের স্কুর্তির দ্বারাও হতে পারবে না।
৪৪. গান-বাদ্য: বাদ্যযুক্ত গান অথবা যৌন আকর্ষণমূলক সুরের গান অথবা চরিত্র ধ্বংসকারী বিষয়বস্তুর গান সমস্ত ইমাম ও আলেগণের একমতে না-জায়েয ও হারাম। এসব ইসলাম বিরোধী तरीকা।
৪৫. নাস্তিকেরা বলে থাকে, ‘সংসার আনন্দময় যার মনে যা নেয়।’ ফিলসফির ক্লাসে পড়ানো হয়, ডারউইন নামক একজন কাফিরের উক্তি যে, মানুষ জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) নন, মানুষ জাতির আদি পিতা বানর। হরবাট নামক একজন কাফিরের উক্তি পড়ানো হয় যে, পরকালের

বিচার বলতে কিছুই নেই, মানুষ এ জীবনেই যা কিছু আনন্দ করে নিতে পারে।

প্রিয় পাঠক! নিশ্চয় জানবেন যে, মানুষ হিসেবে এবং বুদ্ধির দিক দিয়েও নবী-রাসুলের মরতবা বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। তাছাড়া নবী-রাসুলগণ স্বয়ং আল্লাহর নিকট হতে এমন জ্ঞান পেয়ে থাকেন যা বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের কল্পিত জ্ঞানের চেয়ে অনেক উর্ধ্বের জ্ঞান। অতএব খবরদার! এসব বাজে কথার কারণে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক নামীয় লোকদের উজ্জির কারণে আল্লাহর বাণীর প্রতি, নবীর বাণীর প্রতি বিশ্বাস যেন কিছুতেই শিথিল না হয়। কারণ পরকাল সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র নবীর মাধ্যমে, তা আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞান ব্যতিরেকে হাসিল হওয়ার জন্য কোনো উপায় নেই।

একইভাবে মানুষ জাতির আদি পিতা সম্পর্কে জ্ঞানও আল্লাহ প্রদত্ত নবীর মাধ্যমের জ্ঞান ব্যতিরেকে হাসিল হওয়া সম্ভব নয়। এভাবে সাধারণ প্রকৃতির উর্ধ্বের ক্ষমতাও যে আল্লাহর আছে এবং সে ক্ষমতা তিনি তাঁর নবীর মাধ্যমে কচিং প্রকাশও করেছেন। যেমন— হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বেলায় আল্লাহর আদেশে আগুনের দাহিকা শক্তি থাকেনি। হযরত মুসা (আ.)-এর বেলায় আল্লাহর আদেশে সাগরের পানি দ্বিখণ্ডিত হয়ে হযরত মুসা (আ.)-কে পথ দিয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-কে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে আল্লাহ স্বীয় খাস ক্ষমতা প্রকাশ করে বিনা বাপে পয়দা করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ পাক তার খাস ক্ষমতা প্রকাশ করে সাত আসমান পার করে নিয়ে গেছেন এবং বেহেশত-দোযখের এবং পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার স্বচক্ষে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের আজিব শান এমন কি স্বয়ং আল্লাহর দীদারও দেখিয়ে দিয়েছেন।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ও যুক্তিবাদীদের অন্ধ অনুকরণে আল্লাহ-রাসুলের, কুরআন-হাদীসের সত্য উক্তি ও শক্তিকে অস্বীকার করা অতিনির্বুদ্ধিতার কাজ। বিজ্ঞান-দর্শন পড়াতে নিষেধ নেই; কিন্তু অধিকার চর্চা করা পরানুকরণ, অন্ধানুকরণ করা, ঈমান নষ্ট করা ঘোর অন্যায়। সুতরাং সেসব বাজে কথার লোকের বাজে উক্তি পড়ার পূর্বে নিজের ঈমানকে মজবুত করে নিতে হবে এবং কারও বড় বড় বোম্বাস্টিক শব্দ দেখে ভীত প্রভাবান্বিত হওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর চেয়ে সত্য সংবাদ দানকারী আর কেউই নেই, রাসুলের চেয়ে সত্যের দ্বার উদ্ঘাটনকারী আর কেউই নেই। মানুষের কল্পনা ভুল হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর বাণী ভুল হতে পারে না। রাসুলের আসহাবগণ কখনও সত্যের সীমালঙ্ঘন করেননি। এসব হল ইসলাম ও ইসলামের মূল মন্ত্র।

খবরদার, এ আকীদা এ ঈমান কোনো যুক্তিবাদী বা কোনো প্রতারকের প্রতারণায় নষ্ট করবেন না, নতুবা সর্বনাশ হবে।

১০১টি কবীরা গোনাহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْكُمْ سَائِرَ تِلْكَ ۖ

‘তোমরা যদি বড় বড় পাপসমূহ হতে বিরত থাক তবে তোমাদের ছোট ছোট পাপসমূহ আমি সরিয়ে দেব, মা’ফ করে দেব।’^১

এ আয়াত দৃষ্টে এখানে কিছু কবীরা গোনাহ তথা কিছুসংখ্যক বড় বড় পাপের একটি ফিরিস্তি করে দিতে ইচ্ছা করেছি। যাতে সব সময় এ চারটি সামনে রেখে পাপ হতে বিশেষত বড় বড় পাপসমূহ হতে আমরা বিরত থাকতে পারি।

১. শিরক: এটা সর্বাপেক্ষা বড় পাপ। এর বিপরীত তওহীদ। দুনিয়ার জীবনেই তওবা করে তওহীদ গ্রহণ না করে এ পাপের সঙ্গে মরে গেলে শিরক পাপের শাস্তি হতে বাঁচার অন্য কোনো উপায় নেই।
২. উক্কুল ওয়ালিদাইন অর্থাৎ মা-বাপের নাফরমানি করে মা-বাপের মনে কষ্ট দেওয়া কবীরা গোনাহ। এর বিপরীত বিররুল ওয়ালিদাইন অর্থাৎ মা-বাপের খেদমত করা।
৩. কতয়ে রেহেম অর্থাৎ এক মায়ের পেটের ভাই-বোনদের সাথে অসদ্ব্যবহার করা। মার পেটের বলতে দাদীর পেটের চাচা পেটের চাচা, ফুফু, নানীর পেটের মামু, খালা এবং ভাই-বোনের ছেলে-মেয়ে ভতিজা, ভতিজী, ভাগ্নে ভাগ্নী সবই বোঝায়; যে যতো বেশি নিকটবর্তী তার ততো হক বেশি। কতয়ে রেহেমী কবীরা গোনাহ। এর বিপরীত সিলাহ রেহেমী।
৪. যিনা অর্থাৎ নারীর সতীত্ব নষ্ট এবং পুরুষের চরিত্র নষ্ট করা। এটা অতিজঘন্য কবীরা গোনাহ। এর বিপরীত নারীর সতীত্ব রক্ষা করা এবং পুরুষের চরিত্রকে পবিত্র রাখা। নারীর সতীত্ব এবং পুরুষের চরিত্র পবিত্র রাখার জন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফের মধ্যে বেপর্দার নিষেধ করেছেন এবং নারী-জাতির জন্য পর্দা ফরয করেছেন এবং উত্তেজনা বর্ধনকারী যৌন

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৩১

আবেদনকারী যাবতীয় জিনিস ছবি ইত্যাদি দেখাকে হারাম করেছেন। তদ্রূপ বালকদের সঙ্গে কুকর্ম করা যিনার চেয়েও বড় পাপ এবং এর শাস্তিও বড়। বিবাহিত অবস্থায় যিনা করলে এবং তা স্বীকার করলে অথবা চারজন সত্যবাদী স্বাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হলে তার শাস্তি পাথর মেরে প্রাণে বধ করে ফেলানো। আর অবিবাহিত অবস্থায় যিনা প্রমাণ হলে তারা শাস্তি একশত বেত্রাঘাত।

বালকের সঙ্গে কুকর্মকারীর শাস্তি তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া। হযরত ঈসা (আ.) একদিন ভ্রমণের সময় দেখতে পেলেন একটি কবরের মধ্যে একটি মানুষ আগুনের দ্বারা জ্বালানো হচ্ছে। তিনি আল্লাহর নিকট এর ভেদ জানতে চাইলেন লোকটি বলল, এ আগুন সেই বালকটির সঙ্গে কুকর্ম করে বসে ছিলাম। সে কারণে কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে এ ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৫. চুরি করা কবীরা গোনাহ। সাধারণ চুরির চেয়ে বিশ্বাসের ওপর বিশ্বাসঘাতকতা করে চুরি অর্থাৎ আমানতের খেয়ানত করা অনেক বেশি পাপ।
৬. মানুষ খুন করা কবীরা গোনাহ। ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারকারী সংখ্যালঘুকে খুন করা, তার মাল চুরি করা ও তার নারীর সতীত্ব নষ্ট করা এবং কোনো মুসলমানকে খুন করা, তার মাল চুরি করা ও তার নারীর সতীত্ব হরণ করা এক সমান পাপ এবং এক সমান শাস্তি। তিন কারণ ব্যতীত কোনো মানুষের জীবনকে বধ করা যায় না, যথা— ১. মানুষ খুন করলে, ২. বিবাহিত অবস্থায় অন্য নারীর সতীত্ব হরণ করলে, ৩. মুরতাদ হয়ে গেলে অর্থাৎ মুসলমান হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন কথা বললে।
৭. মিথ্যা তোহমত লাগানো। এটাও কীবরা গোনাহ। সবচেয়ে বড় তোহমত যিনার তোহমত। কারও ওপর যিনার তোহমত দিলে তার আখিরাতে দোষখের শাস্তি ছাড়া দুনিয়ার শাস্তি হচ্ছে যে, তাকে আশি দূররা মারতে হবে। এছাড়া অন্যান্য তোহমতের শাস্তি বিচারক এবং সমাজ নেতার বিচার অনুসারে বেশি-কম হবে। যদি কেউ কারও ‘শালা’, ‘চুদির ভাই’ ‘হারামজাদা’ বা ‘তোর মায়েরে...’ ইত্যাদি অশ্লীল ভাষায় গালি দেয় তবে যেহেতু এসব অশ্লীল শব্দের ভেতর যিনার তোহমত আছে কাজেই এ ধরনের অশ্লীল গালিরও শাস্তি আছে। শাস্তির দ্বারা সমাজ পবিত্র হয়। এজন্যই আমি এ অশ্লীল শব্দ কয়টি লিখতে বাধ্য হয়েছি। সুধীপাঠকবৃন্দ আমাকে ক্ষমা করবেন। এ শব্দ কয়টি কেউ মুখে উচ্চারণ করবেন না, শুধু চোখে দেখে যে উপকারে জন্য আমি লিখেছি সেই উপকারটুকু হাসিল করে বাকিটুকু আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। এটিও অতিবড় কবীরা গোনাহ। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অতিবড় পাপ। এরও শাস্তি বিধান করা রাষ্ট্রের ও সমাজের কর্তব্য। মিথ্যা বলা মহাপাপ। এ পাপের প্রতি সমাজের ঘৃণা থাকা দরকার। শৈশবে শিশুরা যাতে মিথ্যায় অভ্যস্ত না হয় সেদিকে গার্জিয়ানের অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার।
৯. যাদু করে কারও ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করাও কবীরা গোনাহ। অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক শয়তান জিনের সাধনা করে মাছ, মাংস পরিত্যাগ করে, পাক-সাহ ফরয গোসল পরিত্যাগ করে, কালীর সাধনা করে যাদুবিদ্যা হাসিল করে মূর্খ সমাজে পীর বা ফকীর নামে পরিচিত হয়ে গোপনে কারও মাথার চুল কেটে নিয়ে, কারও কাপড়ের কোণে কেটে, কারও ঘরের দুয়ারে শ্মশানের কয়লা, শ্মশানের হাড়ের তাবীয পুঁতে, কাউকেও বান মেরে মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করে, এটাকেই যাদু বলে। শরীয়ত অনুসারে এসব অতি বড়পাপ। এ ধরনের ব্যক্তিকে ধরতে পারলে তার শাস্তি বিধান করা সমাজের ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। আখিরাতের শাস্তি পরে হবে, দুনিয়ার শাস্তি এখানেই হওয়া দরকার। বিনাসাক্ষীতে, বিনাপ্রমাণে কারো ওপর কোনো ধরনের (চুরি ইত্যাদির) দোষারোপ করা, এ ভিত্তিতে যে, হয়ত সুরা ইয়াসীন পড়ে লোটা ঘুরানো বা বাটী চালান, চটা চালান, খুর চালান দেওয়াতে অমুকের নাম উঠেছে, এটাও এক প্রকার যাদুরই অন্তর্গত। ইসলাম এ ধরনের নীতিহীন দোষারোপকে কিছুতেই অনুমোদন করেনি।
১০. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ওয়াদা খেলাফ করা, কথা দিয়ে তা ঠিক না রাখা এটাও কবীরা গোনাহ।
১১. আমানতের খেয়ানত করা এটাও কবীরা গোনাহ। খেয়ানত অনেক রকমের আছে। টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তির আমানত, কথার আমানত, কাজের আমানত, দায়িত্বের আমানত ইত্যাদি।
১২. গীবত করা তথা কারও অসাক্ষাতে তার বদনাম ও নিন্দা করা (যদিও তা সত্য হয়) এটাও কবীরা গোনাহ।
১৩. স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে, মনিবের বিরুদ্ধে চাকরকে, ওস্তাদের বিরুদ্ধে শাগরিদকে, রাজার বিরুদ্ধে প্রজাকে, কর্তার বিরুদ্ধে কর্মচারীকে খেপিয়ে তোলা এটাও কবীরা গোনাহ। হাদীস শরীফে আছে,

«لَيْسَ مِنْكُمْ خَبَبٌ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ، وَلَيْسَ مِنْكُمْ أَمْرًا عَلَى

رَوْحِهَا».

‘কোন চাকরকে তার প্রভুর বিরুদ্ধে অথবা স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে যে উস্কায়ে সে আমাদের মুসলমানদের দলভুক্ত নয়।’^১

১৪. নেশা পান করা কবীরা গোনাহ।

১৫. মদের যেমন নেশা হয়, মদ্যপানে যেমন মানুষ বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে উন্মাদ হয়ে যায়, তার চেয়েও মানুষের মধ্যে বড় নেশা হয় যৌনউত্তেজনায় এবং যৌনউত্তেজনা হলে মানুষ বুদ্ধি-বিবেকহারা হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হয়ে যায়। পুরুষজাতির এ যৌন ক্ষুধানেক যারা উত্তেজিত করে অর্থাৎ নারীজাতি যখন যুবক পুরুষদের সামনে তাদের রূপসজ্জা দেখিয়ে বেড়ায়, বানানো রূপ অঙ্গভঙ্গী করে বা নেচে দেখায় বা নগ্নমূর্তি, উলঙ্গ ছবি তাদের সামনে তুলে ধরা হয় (সিনেমার অশ্লীল ছবি দেখান হয়) তখন যুবকদের যৌন ক্ষুধা উত্তেজিত হয়ে তারা হিতাহিত জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে এবং তাদের স্বাস্থ্যের, সম্পত্তির, সময়ের ও স্বচ্ছ মনের এবং সুস্থ বিবেকের ভীষণ ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি যাদের দ্বারা হয়, তারা মহাপাপ করে। অর্থাৎ নারীজাতির রূপসজ্জা পর পুরুষকে দেখিয়ে বেড়ানো, অঙ্গভঙ্গি করে নাচ দেখানো এবং এ পদ্ধতিকে সমর্থন করা মহাপাপ। এজন্য আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে বলেছেন,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ ۖ

‘যিনার কাছেও যাবে না।’^২

অর্থাৎ যে কাজে যিনার উপক্রম হতে পারে সে কাজ করবে না।

১৬. জুয়া খেলা এটাও কবীরা গোনাহ। এর নেশাও মদের নেশা, কামিনী কাঞ্চনের নেশা অপেক্ষা কম নয়। জুয়া খেলা অনেক রকমের আছে। ঘোরদৌড় হোক, কুকুরদৌড় হোক, পাশা খেলা, তাস খেলা হোক, সতরঞ্জ খেলা হোক বা টিকেট ধরা হোক, অর্থাৎ যাতে বাজি ধরা আছে সবই জুয়া খেলা। জুয়া খেলা মহাপাপ। সমাজে ও রাষ্ট্রে এর প্রসার বন্ধ করার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার।

১৭. সুদ: সুদ অনেক প্রকারের আছে-সরল সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ, ব্যাংকের সুদ ইত্যাদি। সর্ব প্রকারে সুদই মহাপাপ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَسْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُنِي الصَّدَقَاتِ ۖ

‘আল্লাহর অটল বিধান, সুদের দ্বারা আসে ধ্বংস, আর যাকাত, খয়রাত ও দানের দ্বারা আসে বরকত।’^৩

^১ আবু ইয়ালা আল-মুসিলী, *আল-মুসনদ*, দারুল মামুন লিত-তুরাস, দিমাশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩০৩, হাদীস: ২৪১৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^২ আল-কুরআন, সূরা *আল-ইসরা*, ১৭:৩২

^৩ আল-কুরআন, সূরা *আল-বাকার*, ২:২৭৬

সুদ ছাড়া ব্যাংক চলিতে পারে, কাজেই এ কেউ মনে করবেন না যে, সুদ না হলে ব্যাংক চলবে কেমন করে? আর ব্যাংক না থাকলে কারবার চলবে কেমন করে? সুদ খাওয়া আর দেওয়া এক কথা নয়। খাওয়া সর্বাবস্থায় মহাপাপ। জীবন বাঁচানোর জন্য সুদ দেওয়া মহাপাপ নয়।

১৮. রেশওয়াত অর্থাৎ ঘুষ খাওয়া। ঘুষের কারণে আল্লাহর অভিশাপ অবতীর্ণ হয়। ঘুষ খাওয়া সর্বাবস্থায় মহাপাপ। যালিমের যুলুমের কারণে নিজের হক নেওয়ার জন্য ঠেকে ঘুষ দিলে তা মহাপাপ নয়, কিন্তু ঘুষ দিয়ে কাজ উদ্ধার করার মনোবৃত্তি এবং প্রথা মহাপাপ।

যাদের সরকারি বেতন ধার্য আছে, তারা কতর্ব্যকাজে অতিরিক্ত যা কিছু নেবে সবই ঘুষ হবে। চাই একটা সিগারেট হোক, চাই এক কাপ চা বা এক খিলি পান বা একটা ডাব হোক। যাদের কোন বেতন ধার্য নেই তারা যদি মজুরি চুক্তি করে কোনো কাজ করে এবং মজুরি নেয় তা ঘুষ নয় বা যারা সরকার পক্ষ হতে বেতনধারী নিযুক্ত নন তাদেরকে, তাদের কোনো মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্মান করে বা ভালবেসে যদি কেউ কোনো উপটৌকন দেয় তবে তা ঘুষ নয়, তা হাদিয়া। কিন্তু এ ধরনের দানের মধ্যে দাতার পক্ষে কোনো ধরনের কাজ উদ্ধারের নিয়ত বা গ্রহীতার পক্ষে কোনো ধরনের লোভের সঞ্চারণ থাকলে তা হাদিয়া থাকবে না, তাও এক প্রকার ছোট রেশওয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

শুধু সুপারিশ করে তার বিনিময়ে কিছু নেওয়া, সত্য সাক্ষ্যদান করে তার বিনিময়ে কিছু নেওয়া, ন্যায়বিচার করে তার বিনিময়ে কিছু নেওয়া, মাসআলা বাতিয়ে কুরআন পড়ে সওয়াব রেসানি করে তার বিনিময় কিছু নেওয়া, মুরীদ করে দীনের সবক বাতিয়ে নসীহত করে তার বিনিময় কিছু নেওয়া এসবও রেশওয়াত পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য ন্যায়বিচার করার জন্য, দীনী সবক বাতানোর জন্য, নসীহত দ্বারা চরিত্র গঠন করার জন্য লোক নিযুক্ত করা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাষ্ট্রের বা সমাজের পক্ষ হতে কিছু রুজি না মুকাররর (প্রাপ্য ধার্য) করে দিলে তা হারাম বা রেশওয়াত হবে না।

১৯. জোর-যুলুমভাবে বা অতর্কিতভাবে কোনো মুসলমানের বা কোনো সংখ্যালঘুর কোনো ধরনের ছোট বা বড় স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হরণ করা বা ভোগদখল করা এটা যেমন মহাপাপ, তদ্রূপ বিধবার খেদমত করা মহাপূণ্য।

২০. অনাথ-এতীমের মাল (বা নিরাশ্রয় বিধবার মাল) খেয়ে ফেলা। এতীম-বিধবার মাল খাওয়া যেমন মহাপাপ, তদ্রূপ বিধবার খেদমত করা মহাপূণ্য।

২১. খোদার ঘর যিয়ারতকামী তথা হজযাত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা কবীরা গোনাহ।

২২. মিথ্যা কসম খাওয়া কবীরা গোনাহ।

২৩. কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া, মুসলমানে মুসলমানে গালাগালি করা কবীরা গোনাহ। কারণ মিথ্যা তোহমত এবং অশ্লীল প্রয়োগ এ দুটি পাপের দ্বারা ‘গালি’ তৈরি হয়। হাদীস:

«سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ».

‘কোনো মুসলমানকে যে গালি দেবে সে ফাসিক হয়ে যাবে।’^১

২৪. জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা কবীরা গোনাহ। জিহাদের আসল অর্থ আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। এমনকি যদি দীনের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিতেও হয় তাতেও কুষ্ঠাবোধ না করা। দীনের দুশমনরা সত্য ধর্মকে দুনিয়া হতে মুছে ফেলার জন্য অনেক দূর হতে অনেক সুস্বাদু কূটনৈতিক চেষ্টা-তদবীর করে সেসব ধরে তার প্রতিকার করা জিহাদের পর্যায়ভুক্ত এবং যে জমানায় যে উপায়ে দীন জারি করা যায় এবং দীনের দুশমনদের জেরবার করা যায়, সে জমানায় সে কাজই জিহাদের পর্যায়ভুক্ত। দীনের খেদমত হতেও পলায়ন করা জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করার শামিল।

২৫. ধোঁকা দেওয়া, বিশেষত শাসনকর্তা বিচারকর্তা কর্তৃক জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া কবীরা গোনাহ। কারবারের মধ্যে, বেচা-কেনার মধ্যে ধোঁকা দেওয়াও মহাপাপ। কিন্তু শাসক বিচারক হয়ে ধোঁকা দেওয়ার তুলনা নেই।

২৬. অহঙ্কার করা কবীরা গোনাহ। পদ পেয়ে বা ধন পেয়ে গরীবদের তুচ্ছ করা বা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করে অন্য কোনো লোকদের হেকারত করা। যেমন-যারা কাপড় বোনায়, তাদের জোলা বলে তুচ্ছ করা, যারা তেল বানায় তাদের তেলি বলে তুচ্ছ করা, যারা কৃষি কাজ করে তাদের চাষা বলে হেকারত করা, যারা আরবীতে ধর্মবিদ্যা চর্চা করে তাদের মোল্লা বলে তুচ্ছ করা ইত্যাদি অহঙ্কার কবীরা গোনাহ মহাপাপ।

২৭. বাদ্য বাজনা করে নাচ-গান করা কবীরা গোনাহ। হযরত (সা.) বলেছেন,

«بُعِثْتُ لِيُخْتِ وَالْمَعَارِيفِ وَالْمَرَامِيرِ، وَأُمِرَ الْجَاهِلِيَّةِ».

‘আল্লাহ আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন জাহিলিয়াতের যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারসমূহ নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য। যেমন- বাঁশী, বাদ্য, বাজনা ইত্যাদি।’^২

^১ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৮০, হাদীস: ১৩২৪০, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

২৮. ডাকাতি করা, লুণ্ঠন করা কবীরা গোনাহ। প্রত্যেক অমুসলমান নাগরিকের জান-মাল ও ইজ্জত পবিত্র আমানত। এ আইনভঙ্গ করা, কারও জান-মাল বা ইজ্জত হরণ করা কবীরা গোনাহ।

২৯. স্বামীর নাফরমানীর করা কবীরা গোনাহ। হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘তিন প্রকার লোকের ইবাদত-বন্দেগি, নামায-রোযা কবুল হয় না। যথা- ১. ক্রীতদাস: যদি তার প্রভুর নিকট হতে ভেসে যায়, ২. স্ত্রী: যদি স্বামীকে নারায় রাখে, ও ৩. মদখোর: যে নেশা পান করে।’

একজন মেয়েলোক স্বামীর হক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তাকে বলেছেন,

«انظري أين أنتِ منه، فإنه جنتك ونارك.»

‘খবরদার! সাবধান থাকবে, সব সময় লক্ষ্য রাখবে স্বামীর মনের মধ্যে তুমি আছে কিনা! নিশ্চয় জেনে রাখ পতিই সতীর গতি। স্বামীই স্ত্রীর বেহেশত এবং দোযখ।’^২

মা আয়িশা (রাযি.) বলেছেন, হে বেটীগণ, তোমরা মেয়েজাতি যদি তোমাদের স্বামীর হক জানতে তবে প্রত্যেকটি নারী তারা স্বামীর পায়ের ধূলা-কাদা মুখের দ্বারা ছাফ করতে।

হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর আইনে যদি কারও জন্য কোনো মানুষকে সেজদা করা জায়েয হত তবে আমি প্রত্যেক স্ত্রীকে আদেশ করতাম, তার স্বামীকে সেজদা করার জন্য।’

স্বামীর এতো বেশি হক স্ত্রীর ওপর। প্রত্যেক স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব হায়া-শরম এবং স্বামীর সামনে চক্ষু নীচে রাখা এবং স্বামীর প্রত্যেকটি আদেশ পালন করা এবং স্বামী যখন কথা বলে, তখন চুপ করে থাকা এবং যখনই স্বামী বাড়ি আসে তখনই খাড়া হয়ে তার কাছে এসে তার কথা শোনা এবং স্বামী বাইরে যায় তখনই খাড়া হয়ে তার কাছে এসে তার কথা শোনা এবং স্বামী যখন শয়ন করতে যায় তখন নিজেকে তার সামনে পেশ করা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ঘর-গৃহস্থালী তার সন্তান-সন্ততি তার ইজ্জত-আবরূর হেফাজত করা; আদৌ কোনো ধরনের খেয়ানত না করা এবং স্বামীর সামনে আসতে খোশবু লাগিয়ে আসা এবং মুখে, শরীরে,

^১ আত-তাবারানী, *আল-মুজামুল কবীর*, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ৮, পৃ. ২১১, হাদীস: ৭৮৫২, হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^২ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.), খ. ৪৫, পৃ. ৩৪১, হাদীস: ২৭৩৫২, হযরত হুসাইন ইবনে মিহসান (রাযি.) থেকে বর্ণিত

কাপড়ে কোনো ধরনের দুর্গন্ধ না হতে পারে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং স্বামীর উপস্থিতিতে সাজ-সজ্জা করা তার অনুপস্থিতিতে সাজসজ্জা না করা এবং স্বামীর ভাই-বোনদের ভালবাসা, তাদের আদর-সম্মান করা এবং স্বামী যা এনে দেয় কমকেও বেশি মনে করে কমেই সম্ভ্রষ্ট থাকা এবং শোকর করা এবং স্বামীর বাড়ির বাইরে না যাওয়া, যদি ঠেকা জরুরতবশত কোথাও যেতে হয়, তবে স্বামীর এজায়ত নিয়ে যাওয়া এবং ময়লা কাপড় পরে, ময়লা বোরকা পরে যাওয়া। হাদীস শরীফে এসেছে যে, ‘কোনো মেয়েলোক তার স্বামীর বাড়ি হতে স্বামীর বিনা এজায়তে বাইরে যায় তার ওপর ফেরেশতাগণ লা’নত করতে থাকে।’

ইসলাম ধর্মের এবং মানব কল্যাণের অনেক শত্রু আছে। তারা বলে থাকে যে, পুরুষেরা নারীদের পরাধীন রেখেছে। একথা মিথ্যা। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই স্ত্রীকে স্বামীর তাবেদারী করে চলতে বলেছেন। কুরআন শরীফে আছে,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۝

‘পুরুষগণ নারীগণের অধিনায়ক।’^১

আবার যেমন— নারীগণকে তাদের স্বামীর পূর্ণ তাবেদারী করার হুকুম করেছেন, তদ্রূপ স্বামীগণকেও তাদের স্ত্রীগণের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হুকুম করেছেন। দুর্ব্যবহার বা জুলুম করতে অতিকঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

‘স্ত্রীগণের সাথে সদ্ব্যবহার কর।’^২

৩০. জায়গা জমির লাইন (সীমানা) নষ্ট করা কবীরা গোনাহ। হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন,

«مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ حُدُودَ الْأَرْضِ».

‘জায়গা জমির সীমানা যে নষ্ট করবে তার ওপর লা’নত।’^৩

হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, ‘জায়গা-জমির সীমানা নষ্ট করে যে এক বিঘত জমি অন্যের জমি হতে হরণ করবে কিয়ামতের দিন তার স্কন্ধে সে পরিমাণ সাত তবক জমিন চাপিয়ে দেওয়া হবে।’

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৩৪

^২ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৯

^৩ আত-তাবারানী, আল-মু’জামুল আওসাত, দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৮, পৃ. ২৩৪, হাদীস: ৮৪৯৭, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

৩১. শ্রমিকের মজুরী কম দেওয়া কবীরা গোনাহ। হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন,
 «أَنَا خَصْمُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ».

‘যে লোক দ্বারা শ্রম করিয়ে তার পূর্ণ মজুরি না দেবে বা পূর্ণ মজুরি দিতে টাল-বাহানা করবে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হয়ে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াবো।’^১

হযরত (সা.) রাষ্ট্রানুগত সংখ্যালঘুর ওপর যুলুমকারীর সম্পর্কেও একই কথা বলেছেন। হযরত (সা.) গরীবের বন্ধু।

৩২. মাপে কম দেওয়া, মালে মিশাল দেওয়া ও খরিদারকে ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি কবীরা গোনাহ। কুরআন শরীফে আছে,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝

‘যারা মাপে কম দেবে তাদের জন্য ওয়ায়িল নামক দোযখ নির্ধারিত রয়েছে।’^২

হাদীস শরীফে আছে,

«مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا».

‘যে ধোঁকা দেবে সে আমার উম্মত নয়।’^৩

৩৩. বিবিকে তিন তালাক দিয়ে হিলা করে আবার সেই বিবিকে নিয়ে গৃহবাস করা কবীরা গোনাহ। এক তো তালাক কথাটাই এমন যা অত্যন্ত জঘন্য কথা, এটাকে শুধু জরুরতের কারণে জায়েয রাখা হয়েছে। নতুবা এর চেয়ে জঘন্য জিনিস আর নেই। হাদীস শরীফে এজন্য এটাকে أَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ যত রকমের জায়েজ জিনিস আছে তার মধ্যে এর চেয়ে খারাপ জিনিস আর নেই। তারপর আবার তিন তালাকের দ্বারা বিবি হারামে মুগাল্লাযা হয়ে গেছে, সে বিবিকে হিলা করে ঘরে রাখা, এর চেয়ে জঘন্য জিনিস আর কি হতে পারে। এজন্য হাদীস শরীফে দু’জনের ওপর লা’নত বর্ষিত হবে বলে বলা হয়েছে,

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

^১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৮২, হাদীস: ২২২৭, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন, ৮৩:১

^৩ আত-তিরমিযী, আল-জামি’উল কবীর = আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী অ্যাড সন্স পাবলিশিং অ্যাড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ২, পৃ. ৫৯৭, হাদীস: ১৩১৫, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

‘যে হিলা করবে এবং যার জন্য হিলা করা হবে দু’জনের ওপরই লা’নত বর্ষিত হবে।’^১

হযরত ওমর (রাযি.)-এর জমানায় আইন ছিল যদি কেউ হিলা করত, তবে তাকে সঙ্গসার করা হত অর্থাৎ পাথর মেরে তাকে মেরে ফেলা হত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, একজন তার চাচাত বোন বিয়ে করেছিল, রাগবশত তিন তালাক দিয়ে এখন আবার হিলা করে তাকে রাখতে চায়, তিনি ফতওয়া দিয়েছিলেন যে, উভয়ই যিনাকার সাব্যস্ত হবে, যদিও ২০ বছর পর্যন্ত গৃহবাস করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর নিকট একজন লোকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার চাচাত ভাই তার বিবিকে তিন তালাক দিয়ে এখন অনুতপ্ত হয়ে আবার তাকে হিলা করে আনতে চায়। তিনি ফতওয়া দিয়েছিলেন, তোমার চাচাত ভাই আল্লাহর নাফরমানী করেছে। আল্লাহ তাকে এ শাস্তি দিয়েছেন, সে শয়তানের তাবেদারী করেছে সেজন্য আল্লাহ তার জন্য আর কোনো পথ বাকী রাখেননি। অনুরূপভাবে সমস্ত ইমামগণের ফতওয়াই হচ্ছে যে, হিলা করা হারাম কবীরা গোনাহ।

৩৪. ঘোড় দৌড় বা রেস খেলা কবীরা গোনাহ। যেহেতু এর মধ্যে বাজি ধরা আছে, যাতে বাজি ধরা আছে, তা জুয়া। অতএব হারাম মহাপাপ।
৩৫. সিনেমা খেলা কবীরা গোনাহ। কারণ এর মধ্যে উত্তেজনামূলক ছবির খেলা দেখানো হয়, যা দ্বারা যুবকদের স্বাস্থ্য নষ্ট, স্বভাব নষ্ট এবং মাতৃজাতির অবমাননা করা হয়, এটা অতিবড় জঘন্য পাপ। এর পার্ট ও প্লে করা, এর ব্যবসা করা, এর ইডভারটাইজ করা সবই কবীরা গোনাহ মহাপাপ।
৩৬. পেশাব করে পানি না নেওয়া কবীরা গোনাহ। পেশাবের ছিটা ফোটা হতে বেঁচে না থাকার দরুন কবর আযাব হয়। হযরত রাসূল (সা.) আমাদের এ বিষয়ে সচেতন করে গেছেন। নাসারাগণ পেশাব করে পানি নেয় না। হায়ওয়ানের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করে, আর তাদের দেখাদেখি যারা তদ্রূপ করে তারা বড়ই হতভাগা।
৩৭. চোগলখোরী করা, কোটনামী করা কবীরা গোনাহ।
৩৮. গণকের কাছে যাওয়াও মহাপাপ কবীরা গোনাহ।
৩৯. মানুষের বা অন্য কোনো জীবের ফটো আদর করে ঘরে রাখা কবীরা গোনাহ।

^১ আদ-দারিমী, *আস-সুনান* = *আল-মুসনদ*, দারুল মুগনী, রিয়াদ, সউদী আরব, খ. ৩, পৃ. ১৪৫০, হাদীস: ২৩০৪, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত

৪০. পুরুষের জন্য সোনার আংটি বা রেশমী লেবাস পরা এবং মেয়েলোকের জন্য শরীরের রূপ ঝলকে এ ধরনের পাতলা লেবাস পরা কবীরা গোনাহ।
৪১. গর্ভভরে লুঙ্গি, পায়জামা ও প্যান্ট পায়ের গিরার নীচে লটকিয়ে চলা কবীরা গোনাহ। আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন,

وَلَا تَبْسِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۝

‘মাটির ওপর দিয়ে গর্ভভরে চলবে না।’^১

আরও বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

‘আল্লাহর নিকট মানুষের অহঙ্কার এবং ফখর অত্যন্ত না-পছন্দ।’^২

হাদীস শরীফে হযরত রাসূল (সা.) ফরমায়েছেন,

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُرَكِّبُهُمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ».

‘তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিনে রহমতের নজর করবেন না, তাদের সঙ্গে মেহেরবানির কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। যথা- ১. যে অহঙ্কারের সাথে লুঙ্গি, পায়জামা লটকিয়ে পরবে, ২. যে উপকার করে খোঁটা দেবে, ৩. যে মিথ্যা কসম খেয়ে জিনিস বিক্রয় করবে।’^৩

৪২. বংশ বদলিয়ে অর্থাৎ বাপ বদলিয়ে দেওয়া (যেকোনো মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে) কবীরা গোনাহ।

৪৩. ঝগড়া-বিবাদ করে মিথ্যা মুকাদ্দমা করা। মিথ্যা মুকাদ্দমার পায়রবী করাও কবীরা গোনাহ। কোন ময়লুমের হক আদায় করার জন্য মুকাদ্দমা করা এবং সত্য মুকাদ্দমার তদবীর-পায়রবী করা জায়েয আছে, কিন্তু মিথ্যা মুকাদ্দমা জেনে শুনে তার তদবীর পায়রবী করা কিংবা মিথ্যা না জেনে মুকাদ্দমার তদবীর করাও দুরস্ত নয় এবং মুকাদ্দমায় জিতিয়ে দেব এ চুক্তিতে মুকাদ্দমার তদবীর করাও জায়েয নয়।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:৩৭

^২ আল-কুরআন, সূরা লুকমান, ৩১:১৮

^৩ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস: ২৪৮১৩, হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

৪৪. মৃত ব্যক্তির ওয়াসীয়াত পালন না করা কবীরা গোনাহ। অবশ্য ওয়াসীয়াত শরীয়তসঙ্গত হওয়া চাই। শরীয়ত বিরোধী ওয়াসীয়াত করাও কবীরা গোনাহ।

৪৫. কোনো মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়া কবীরা গোনাহ।

৪৬. জাসুসি করা অর্থাৎ মুসলমান সমাজের এবং মুসলমান রাষ্ট্রের ভেদের কথা দুর্বল পয়েন্টের কথা অন্য সমাজের লোকের কাছে অন্য রাষ্ট্রের কাছে প্রকাশ করা মহাপাপ কবীরা গোনাহ। ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারায় যে একটি রাত কাটাবে সে সারা দুনিয়া ব্যাপী ধনরত্ন দান করার তুল্য সওয়াব পাবে।
«رَبَّاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^১ এ হাদীসের অর্থ এটিই।

৪৭. নর হয়ে নারীর বেশ ধারণ করা এবং নারী হয়ে নরের বেশ ধারণ করাও কবীরা গোনাহ। শুধু বেশ নয়, নারী হয়ে নরের সমান অধিকার দাবি করে দরবারে, মাঠে ময়দানে এবং হাটে-বাজারে বিচরণ করা এবং নর হয়ে অক্ষম সাজিয়া ঘরে বসে থাকা, এটাও তারই পর্যায়ভুক্ত।

হযরত রাসূল (সা.) আমাদের সতর্ক করে গেছেন এবং বলে গেছেন,

«لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ
بِالنِّسَاءِ».

‘আল্লাহর অভিশাপ পতিত হবে সেসব নারীর পর যারা নরের বেশ ধারণ করবে এবং সেসব নরের ওপর যারা নারীর বেশ ধারণ করবে।’^২

৪৮. টাকা বা নোট জাল করাও কবীরা গোনাহ।

৪৯. দিল এমন শক্ত হওয়া, যাতে দুঃখীর দুঃখ দেখে দরদ না হয়, দয়া না আসে, তাও কবীরা গোনাহ।

৫০. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারার ত্রুটি করা এবং দেশের জরুরি রসদ, খাদ্য বা হাতিয়ার চোরা চালান বা পাচার করা কবীরা গোনাহ।

৫১. রাস্তা-ঘাটে বা ছায়াদের ফলদার বৃক্ষের নীচে পায়খানা করা কবীরা গোনাহ।

^১ আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর* = *আস-সুনান*, মুত্তফা আলবাবী অ্যাড সঙ্গ পাবলিশিং অ্যাড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৩, পৃ. ২৪০, হাদীস: ১৬৬৪, হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^২ আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৪, পৃ. ২১২, হাদীস: ৪০০৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

৫২. বাড়ি-ঘর, আনাচ-কানাচ, থালা-বাসন, কাপড়-চোপড়, দেহাত্মা, মন-মস্তিস্ক
নোংরা বা গান্ধা করে রাখাও কবীরা গোনাহ।
৫৩. হায়েয অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করা কবীরা গোনাহ।
৫৪. যাকাত না দেওয়া কবীরা গোনাহ।
৫৫. ইচ্ছা করে এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা করা মহাপাপ কবীরা গোনাহ।
৫৬. মাছে রমযানের একদিনের রোযাও বিনাওযরে ভেঙে ফেলা মহাপাপ কবীরা
গোনাহ।
৫৭. জনগণের কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দাম বাড়ানোর জন্য জীবিকা নির্বাহোপযোগী
খাদ্য-খাদক জিনিস-পত্র গোলাজাত করে বন্ধ করে রাখা কবীরা গোনাহ।
৫৮. ষাঁড় বা পাঠার দ্বারা গাভী বা ছাগী পাল দিতে না দেওয়া কবীরা গোনাহ।
৫৯. পড়শিকে কষ্ট দেওয়া (যদিও সে ভিন্ন জাতির হয়) কবীরা গোনাহ।
৬০. যার মাল আছে বা মাল উপার্জন করার শক্তি আছে, এমন লোক লোভের
বশীভূত হয়ে দান প্রার্থী হওয়া অর্থাৎ সওয়াল করা কবীরা গোনাহ।
৬১. জনগণে চায় না তা সত্ত্বেও তাদের ইমামত অর্থাৎ নেতৃত্ব করা কবীরা
গোনাহ।
৬২. নিজের দোষ না দেখে পরের দোষ দেখে বেড়ানো এবং নিজের প্রশংসা
নিজে করা কবীরা গোনাহ।
৬৩. বদ-গোমামী করা অর্থাৎ বিনা সাক্ষী-প্রমাণে অন্য মুসলমানের প্রতি খারাপ
ধারণা পোষণ করা কবীরা গোনাহ।
৬৪. ইলমে দীনকে তুচ্ছ করে ইলমে দীন হাসিল না করা বা হাসিল করে আমল
না করাও মহাপাপ কবীরা গোনাহ।
৬৫. বিনাজরুর লোকের সামনে সতর (গুপ্তাঙ্গ) খোলা কবীরা গোনাহ। পুরুষের
সরত নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের সতর বেগানা পুরুষের সামনে
মাথা হতে পা পর্যন্ত। এগানা মাহরামের সামনে বুক হতে হাঁটু পর্যন্ত।
৬৬. মেহমানের খাতির ও আদর-যত্ন অভ্যর্থনা না করা কবীরা গোনাহ।
৬৭. ছেলেদের সঙ্গে কুকর্ম তথা পুংমৈথুন করা মহাপাপ অতি বড় কবীরা
গোনাহ।
৬৮. যোগ্য সংকর্মীকে নিযুক্ত, নির্বাচিত বা মনোনীত না করে আত্মীয়তা দল-পুষ্টি
বা অন্য কোনো স্বার্থের বশীভূত হয়ে বা জনস্বার্থে অমনোযোগী হয়ে অযোগ্য
অসৎ অকর্মাকে নিযুক্ত, নির্বাচিত বা মনোনীত করা কবীরা গোনাহ।
৬৯. নিজে ইচ্ছা করে দাবি করে পদপ্রার্থী হওয়া বা পদ গ্রহণ করা কবীরা
গোনাহ।

৭০. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদ্রোহীতা করা কবীরা গোনাহ।
৭১. নিজের বিবি-বাচ্চার খবর-বার্তা না নিয়ে তাদের নষ্ট হয়ে যেতে দেওয়া কবীরা গোনাহ।
৭২. খাতনা না করা মহাপাপ।
৭৩. অসৎ কাজ অন্যায় কাজ হতে দেখে তাতে পারতপক্ষে বাধা না দেওয়া, কিছু না বলা কবীরা গোনাহ।
৭৪. অন্যায়ের সমর্থন কবীরা গোনাহ।
৭৫. আত্মহত্যা মহাপাপ।
৭৬. স্ত্রী-সহবাস করে গোসল না করা কবীরা গোনাহ।
৭৭. পেশাব-পায়খানা করে পবিত্রতা হাসিল না করে অপবিত্র থাকা কবীরা গোনাহ।
৭৮. স্ত্রী পুরুষের নাভীর নীচের পশম, বগলের পশম বর্ধিত করে রাখা মহাপাপ।
যেমন— পুরুষের জন্য দাড়ি মুশানোর অভ্যাস স্ত্রীলোক সাজা এবং স্ত্রীলোকের মাথার চুল রাখা ওয়াজিব। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের নাভির নীচের পশম এবং বগলের পশম পরিস্কার করে ফেলা ওয়াজিব।
৭৯. ওস্তাদ ও পীরের সঙ্গে বেয়াদবি করা, কুরআন-হাদীসের আলেমের, কুরআনের হাফেযের অমর্যাদা করা মহাপাপ। পীর বলা হয় যিনি কুরআন-হাদীসের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কার্যকরীভাবে শিক্ষা দেন তাঁকে। আর ওস্তাদ বলা হয় যিনি কুরআন-হাদীসের যাহেরী মতলব পড়িয়ে শিখিয়ে দেন তাকে। ওস্তাদ ও পীর উভয়েরই বড় হক। এভাবে যারা কুরআন শরীফ হিফয করে হাফিয হন বা কুরআন-হাদীসের মানে মতলব আসল আরবী ভাষায় পড়ে বুঝে সে অনুযায়ী আমল করেন এবং লোকসমাজকে সে অনুযায়ী আমল করতে উপদেশ দেন তাদের অতিবড় মরতবা। যারা তাদের প্রতি আন্তরিক মর্যাদা দেয় না তারা মহাপাপী।
৮০. শুয়োরের গোশত খাওয়া মহাপাপ। একথা বলার দরকার ছিল না, যেমন দরকার নেই একথা বলার যে, মল-মূত্র ভক্ষণ করা মহাপাপ। কিন্তু যেহেতু শোনা যায় যে, যারা বিলাত যায় তারা নাকি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ শুয়োরের গোশত খেতে ঘৃণাবোধ করে না। সেজন্য একথাটাও লেখার দরকার হয়েছে।
৮১. হস্তমৈথুন করা মহাপাপ।
৮২. যাঁড়, কবুতর বা মোরগ ইত্যাদির লড়াই দেওয়া কবীরা গোনাহ।
৮৩. কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া কবীরা গোনাহ।

৮৪. কোনো জীবন্ত জানদার জীবকে আগুন দিয়ে জ্বালানো কবীরা গোনাহ। যদি সাপ, বিচ্ছু, ভীমরুল, বল্লা ইত্যাদি দুষ্ট কষ্টদায়ক জীব হতে বাঁচার আর কোনো উপায় না থাকে তবে আগুন দিয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করায় আশা করা যায় যে, কোন গোনাহ হবে না।
৮৫. আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া কবীরা গোনাহ।
৮৬. আল্লাহর আযাব হতে নির্ভীক হয়ে যাওয়া কবীরা গোনাহ।
৮৭. হালাল জানোয়ারকে আল্লাহর নামে যবেহ না করে অন্য উপায়ে মেরে খাওয়া বা যে জীব কোনো আঘাত লেগে বা অন্য কোনো উপায়ে মরে গেছে সে মৃত জীব খাওয়া কবীরা গোনাহ।
৮৮. অপব্যয় করা কবীরা গোনাহ।
৮৯. বখিলী ও কনজুসী করা কবীরা গোনাহ।
৯০. রাজকীয় ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আইন সমর্থন না করে অনৈসলামিক আইন সমর্থন করা কবীরা গোনাহ।
৯১. ইসলামী আইন হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্রের আইন অমান্য করা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা কবীরা গোনাহ।
৯২. ডাকাতি করা লুণ্ঠতরাজ করা বা পকেট কেটে বা হঠাৎ চোখের অদেখা অসর্তকার সুযোগে মাল চুরি করা কবীরা গোনাহ।
৯৩. ছোটজাত, ছোট পেশাদার বলে বা জোলা, তেলি, শিকারী, কামার, কুমার, বান্দীর বাচ্চা ইত্যাদি বলে কাউকে হেকারত করা বা খোঁটা দেওয়া কবীরা গোনাহ।
৯৪. বিনাএজাযতে কারও বাড়ির ভেতরে বা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করা কবীরা গোনাহ।
৯৫. পরের দোষ তালাশ করে বেড়ানো কবীরা গোনাহ।
৯৬. মানুষের কষ্ট হয় এমন খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি দেখে খুশি হওয়া কবীরা গোনাহ।
৯৭. সুরত-শেকলের কারণে বা গরীব হওয়ার কারণে কোনো মুসলমানকে টিটকারী বা ঠাট্টা বিদ্রোপ করা কবীরা গোনাহ।
৯৮. বিনা-ইযাজতে কারো বাড়ির ভেতর বা ঘরের ভেতর প্রবেশ করা কবীরা গোনাহ।
৯৯. পরের দোষ তালাশ করে বেড়ানো কবীরা গোনাহ।
১০০. মানুষের কষ্ট হয় এমন খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি দেখে খুশি হওয়া কবীরা গোনাহ।
১০১. সুরত-শেকলের কারণে বা গরীব হওয়ার কারণে কোনো মুসলমানকে টিটকারী বা ঠাট্টা-বিদ্রোপ করা কবীরা গোনাহ।